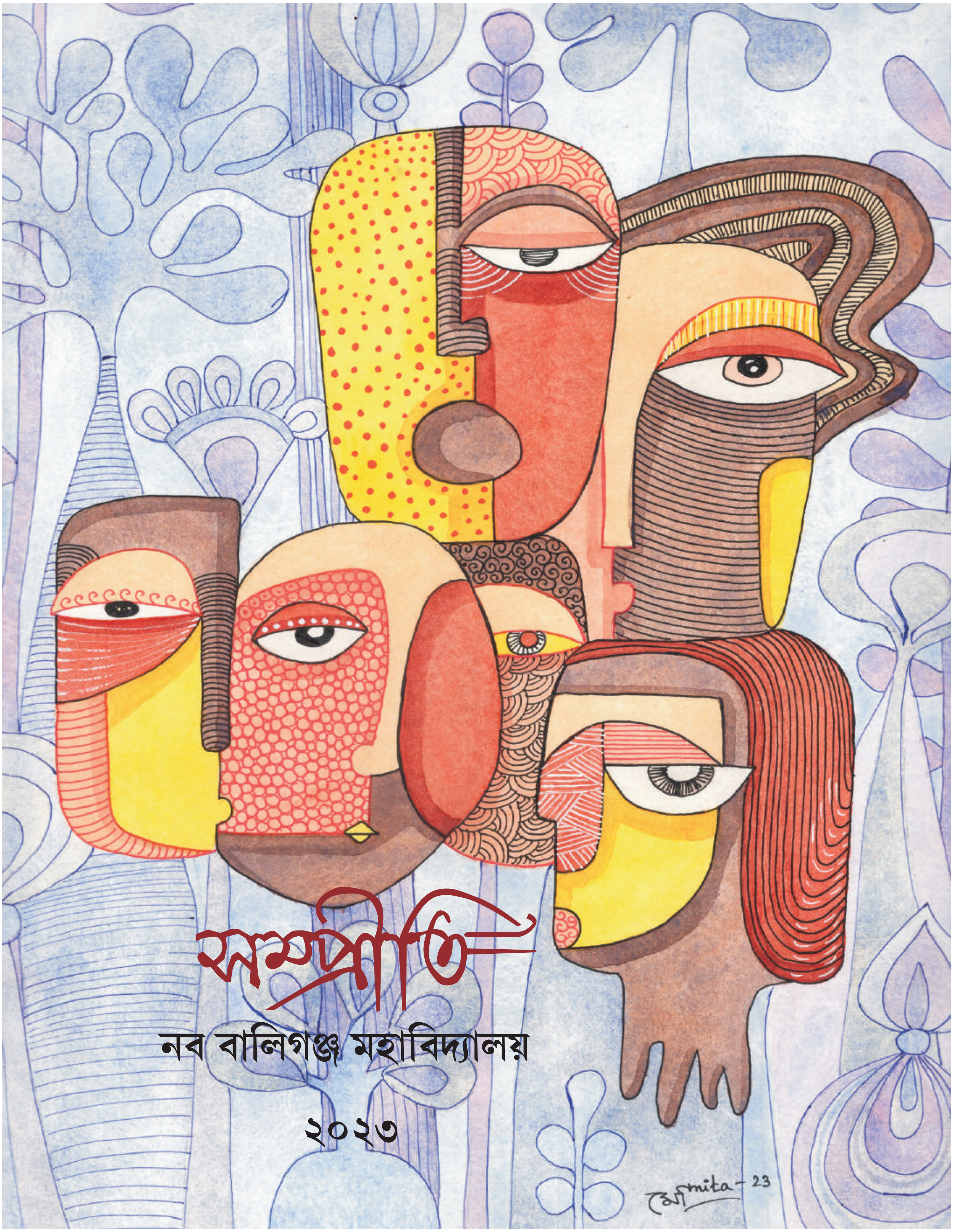

সম্প্রীতি

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

২০২৩

সম্প্রীতি

২০২৩

Sampriti
ISSN: 2278 3792

প্রধান উপদেষ্টা ঃ ড. সুকমল দত্ত (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) এবং ড. অয়ন্তিকা ঘোষ (অধ্যক্ষ)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ ড. সুমিত কুমার দেবনাথ, অধ্যাপক শুক্লা বিশ্বাস

প্রকাশক ঃ অধ্যাপক অয়ন্তিকা ঘোষ (অধ্যক্ষ, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ অধ্যাপক অন্বেষা সেনগুপ্ত, অধ্যাপক পৃথা চ্যাটার্জী
অধ্যাপক প্রিন্স বিশ্বাস, ড. মধুপর্ণা চক্রবর্তী, ড. মনীষা স, শ্রী বিকাশ মণ্ডল

প্রকাশস্থান - নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

গ্রন্থসত্ব - নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক ঃ অধ্যাপক অম্লান দেব, অধ্যাপক বীথিকা আহানা

মুদ্রক ঃ প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২ কসবা রোড, কলকাতা-৭০০০৪২ (৮৯৮১৭৫২১০০)

প্রচ্ছদ ঃ মৌমিতা কর্মকার (ছাত্রী, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ)

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

সূচি

সম্পাদকীয়
মূর্ছনার কথা
অধ্যক্ষের কলমে
প্রাক্তন অধ্যক্ষের কিছু কথা

ভিখারি	আকাশ ব্যানার্জি	০৯
বিদায়ের প্রাক্কালে	তনয়া মণ্ডল	১০
ভালোবাসার শহর	দীপাশা দাস	১১
আগে ও পরে	পল্লবী হালদার	১২
অভিযোগ	প্রীতি মাকাল	১৩
মায়ের অভিমান	রিঙ্কি মণ্ডল	১৪
হয়তো	শীলা বেরা	১৫
যুদ্ধ	সম্বিত বোস	১৬
দিনচরা-রাতচরা	সম্বিত বোস	১৭
একুশে বর্ষা	সুজাতা দাস	১৮
স্বপ্নরাজ্য	অনামিকা আদক	১৯
তারাক্ষেত্রে রঞ্জন	অভিপ্রিয় ভুঁইঞ্যা	২০
মৃত্যুগামী বাস	মৌমিতা কর্মকার	২৬
এক জোড়া জুতো	মৌসুমী ভৌমিক	২৭
অকর্মা	রামপ্রসাদ বেরা	২৯
প্রতিবাদের ভাষা	শুচিস্মিতা ভদ্র (সরকার)	৩৩
স্মৃতির শহর	শুভম রায়	৩৮
লকডাউনের প্রভাব	নীলাব্জ মুখার্জী	৪৫
ফ্রি ফায়ার ও পাবজি	প্রিন্স বিশ্বাস	৪৬
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর ক্রমবিকাশ	রাণু অধিকারী	৫১
নমঃশূদ্র সমাজে প্রচলিত গান	শুক্লা বিশ্বাস	৫৪
Ode to the Angel of Correction	Debojyoti Dan	61
Understanding Sustainable Development, Economical growth and India then & now	Dr. Sumit Kumar Debnath	63

ESSAY WRITING
Social Isolation : Mental and Physical well-being
Madhurya Dey
Papui Das
Sakura Koner

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতি, ২০২৩ প্রকাশিত হল। আমাদের কলেজ পত্রিকাটির বয়স বাড়ল আরও একবছর। একে একে তার মুকুটে নতুন নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। ISSN নম্বর পাওয়া, বাণিজ্য এবং বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ যুক্ত হওয়া, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের ছেলেমেয়েদের লেখা, ছবি পাওয়া, বিভিন্ন ছোটোবড় পালাবদল... কিন্তু নতুন নতুন ছাত্রদের লিখিত প্রকাশে এর মেজাজ চিরনতুন। এই কলেজে যেমন কলকাতাকেন্দ্রিক ছাত্র আসে তেমনই আসে পাশ্ববর্তী জেলার বিভিন্ন কোণ থেকে। ফলে সম্প্রীতির লেখাগুলিতে সেই বৈচিত্র্যও ধরা পড়েছে। বিষয়েও আছে বৈচিত্র্য। সৃজনশীল এবং গবেষণামূলক বিবিধ সংরূপে অধ্যাপক ছাত্র উভয়েই তাদের প্রকাশকে বেঁধেছেন। এই লেখাগুলির পাশাপাশি থাকছে 'মূর্ছনা'র কলেজ ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার নির্বাচিত লেখাগুলি। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, অধ্যক্ষ ড: অয়ন্তিকা ঘোষ এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুকমল দত্তকে। এই সংখ্যার নির্মাণে তাঁদের উৎসাহ এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। কৃতজ্ঞতা জানাই কলেজের সকল অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের, গ্রন্থাগারিকদের, আমাদের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাবে নিশ্চিত। তার জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী। সামনের বছরগুলিতে আরও ভাল করে পত্রিকা প্রকাশের অঙ্গীকার রইল।

মূর্ছনার কথা

২০১৮ থেকে নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় 'মূর্ছনা' নামে একটি আন্তঃ-কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Inter-College Cultural Competition) আয়োজন করছে। অতিমারীকালেও দু'বছর অনলাইনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ বছরও ১১, ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এবছর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও উত্তর ২৪ পরগণা থেকে ২২টি কলেজের প্রায় ১৩০জন ছাত্রছাত্রী প্রবল উৎসাহে অংশগ্রহণ করেছিল। সংগীত, নৃত্য, আলপনা, ক্রাফট ও ফটোগ্রাফি - এই পাঁচটি বিভাগে প্রতিযোগীরা তাদের সৃষ্টি-নৈপুণ্যকে প্রকাশ করে। উপস্থিত বিচারক ও দর্শকরা প্রতিযোগীদের প্রতিটি শিল্প-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হন এবং অত্যন্ত প্রশংসা করেন। অন্যান্য বছরের মতো অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট দিনে পুরস্কারপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়।

অধ্যক্ষের কলমে

‘অন্ত নিয়ে এতটা ভেবো না
রাখো এ প্রবাহ
শেষ বিশ্বাসের সামনে কথা দাও তুমি দেশ
তুমিই এ প্রসারিত দেশ
তোমারই স্নায়ুর মধ্যে বহমান কাল --’

শঙ্খ ঘোষের এই আখরে আজ স্নাত হই বরং। বিশ্বাসে জাগুক ভরসা। মনে থাকুক পৃথিবীর পালাবদল। এই নতুন ঘর আমার ঘিরে থাকুক কবুতররা। স্বপ্ন মিশুক শ্রান্তিহীন পথ চলার। নিঃশব্দে জেগে থাকুক পদক্ষেপ। ঘূর্ণি হাওয়া এলে, ধুলোয় লুটিয়ে না পড়ে বাঁধন পড়ুক ভালোবাসার। সরে যাক করুণ দুপুরগুলো। হাজার হাজার চোখে আসুক প্রত্যয়ের জোয়ার। দেখা হোক প্রতিদিন।

- অয়ন্তিকা ঘোষ

কিছু কথা

ড.সুকমল দত্ত
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

জীবন অনেকটা উপন্যাসের মতো। অনেক অধ্যায়ে সাজানো, অজস্র ঘটনা ও চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ববহুল পথেই তার অগ্রগতি। আর, একটি কলেজের জীবন তো মহাকাব্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ক্রমাগতই এগিয়ে চলা। আমার জীবনের প্রায় ২০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার পালনের মধ্য দিয়ে। সেই বহুদূর প্রসারিত অলিখিত মহাকাব্যের সূচনাকালের একটি পর্ব আমার জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গেল। সূচনাপর্বের সুখস্মৃতির কিছু স্মরণীয় পৃষ্ঠা আজ বিবৃত করছি। ভবিষ্যতের ইতিহাস নিশ্চয়ই এগুলো মনে রাখবে।

২০০৩ সালের ২৩ নভেম্বর তৎকালীন চারুচন্দ্র ইভনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আমার যোগদান। তখন কলেজে দুটি বিভাগ ছিল – হায়ার সেকেন্ডারি এবং ডিগ্রি কোর্স। ছাত্রসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতশো। তার মধ্যে পাঁচশো হায়ার সেকেন্ডারি বিভাগের এবং বাকি ডিগ্রি কোর্সের। কলেজে তখন দুটি বিষয়ে অনার্স – বাংলা ও বাণিজ্য। আমি তখন কলেজ পরিচালন সমিতির সহায়তায় আরো নতুন বিভাগ খোলায় সচেষ্ট হই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল জানিয়ে দেয়, যেহেতু কলেজের নিজস্ব ভবন আছে তাই ইভনিং কলেজের জন্য কোন নতুন সাম্মানিকসহ বিষয় দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব কলেজকে ডে কলেজে রূপান্তরের প্রচেষ্টা শুরু হলো। প্রথম পরিবর্তন হবে নাম। প্রস্তাবিত হলো দুটি নাম – নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় এবং New Ballygunge College. অবশেষে কলেজ পরিচালন সমিতি কলেজের পক্ষে বাংলা নামটিই গ্রহণ করলো। এরপর বিভিন্ন সরকারি নিয়মনীতি মান্য করে কলেজের নাম আইনসঙ্গতভাবে স্বীকৃত হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা সংসদে। ২০০৫ সালের জুলাই মাস থেকে নিজস্ব ভবনে পথ চলা শুরু হলো নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের।

শৈশবকাল অতিক্রম করে সে ক্রমশ নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখল। নতুন নতুন বিষয় ও পাঠক্রম শুরু হলো। ইংরাজি ও ইতিহাসে সাম্মানিক পাঠের সূচনা হলো। এডুকেশন বিভাগের পাঠ শুরু হলো। ধীরে ধীরে কলেজগুলো থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাঠক্রম উঠে গেল। কিন্তু নতুন নতুন বিষয়ের পাঠক্রম আরম্ভ হওয়ায় এবং কলেজের স্থান সমস্যা না থাকায় কলেজ অচিরেই স্বনামে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হলো।

আমাদের কলেজের অন্যতম স্তম্ভ শিক্ষকবৃন্দ। কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদের শিক্ষকরা নির্বাচিত হয়ে আসেন। ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁরা প্রতিনিয়ত পাঠদানে অক্লান্ত। নিজস্ব শিক্ষাগত শৃঙ্খলাতেও তাঁরা যথেষ্ট সপ্রতিভ। আমি এবং একাধিক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট করেছি। বেশ কয়েকজন শিক্ষক আরো উচ্চতর

স্থানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে যোগদান করেছেন।

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই সফলভাবে নানান রাজ্যস্তরের এবং জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে পেরেছে। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও পরিচালন সমিতির সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত দশ থেকে এগারোটি এই জাতীয় সভা আমরা সফলভাবে করেছি। আরো বড়ো বিষয় এই সভাগুলিতে পঠিত গবেষণাপত্রগুলি থেকে কয়েকটিকে নির্বাচিত করে আমাদের কলেজ ISBN নম্বর যুক্ত করে দশটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এমনকি বঙ্গবাসী কলেজের একটি আলোচনাচক্রের কিছু নির্বাচিত গবেষণাপত্রের প্রকাশকও নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়। এটি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক কার্যাবলীর একটি অনন্য নজির। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের কথাও বলতে হয়। পূর্বতন কলেজে গ্রন্থাগারের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কিন্তু বর্তমানে চোদ্দ হাজারের অধিক মূল্যবান গ্রন্থসম্বলিত একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গ্রন্থাগার আমরা তৈরি করতে পেরেছি। আমাদের NSS শাখাটিও অত্যন্ত সক্রিয় ও সচল বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে। কলেজ ভবনেও বিগত কয়েক বছরে নানান সরকারি সাহায্যে আরো দুটি তল নির্মিত হয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আমরা নিয়মিতভাবে আয়োজন করি। আমাদের কলেজের নিজস্ব পত্রিকা আছে, যেখানে ছেলেমেয়েদের সুপ্ত প্রতিভা লেখনীর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের পত্রিকাও আছে, যেখানে আমন্ত্রিত লেখা এবং কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মননশীল রচনা প্রকাশিত হয়। প্রতিটি পত্রিকাই ISSN নম্বর যুক্ত এবং অত্যন্ত প্রশংসিত।

আমাদের কলেজের গুরত্বপূর্ণ শিক্ষাক্রম স্নাতকোত্তর বিভাগ। সন্ধ্যাবেলা কলেজভবনটি অব্যবহৃত থাকায় সেখানে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার পরিকল্পনা করি। সেই প্রচেষ্টা সফল হয় ২০১৩ সালে। বাংলা এবং বাণিজ্য বিভাগে নিয়মিত স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের সূচনা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে। এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক গর্বের বিষয়, স্নাতকোত্তরের দুটি বিভাগের জন্য তিনজন করে মোট ছয়জন সর্বক্ষণের শিক্ষক আমরা পেয়েছি; যা পশ্চিমবঙ্গের আর কোন কলেজ পায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের স্নাতকোত্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যয়ও বহু কলেজের তুলনায় কম।

সর্বশেষে বলি, সেই ছোট কলেজ থেকে এই মহাবিদ্যালয়ের অগ্রগতির যাত্রাপথে প্রতিটি কাজেই কলেজ পরিচালন সমিতির, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা এবং ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক সহযোগিতা আমি পেয়েছি। যদিও অফিসের শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বরাবরই অনেক কম তথাপি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সব কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। বহু মানুষের শুভেচ্ছা, সুপরামর্শ আমাদের প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলার পথে প্রেরণা দিয়েছে। তাদের সকলের প্রতি রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আজ আমার জীবনের এই পর্বের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আশা করবো, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় আরোঅনেক অনেক দূর অগ্রসর হবে। তার পরিচিতি, তার খ্যাতি আরো বহুদূর প্রসারিত হোক। সকলের জন্য রইলো আমার অফুরন্ত শুভকামনা।

ভিখারি

আকাশ ব্যানার্জী
স্নাতকোত্তর বাংলা (প্রথম বর্ষ)

দুঃখ কষ্টে কাটছে জীবন তাদের
খোলা আকাশের নীচে বাস।
সভ্য সমাজের মানুষ তাদের
ভিখারি বলে করে উপহাস।
পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই
নেই তো তাদের ঘর।
সারাদিনটা কাটে ক্ষুধার জ্বালায়
রাত্রি যখন হয়।
ফুটপাতের রাস্তায় তাদের
তখন আসল পরিচয়।
শিক্ষার সব দরজাগুলো
তাদের জন্য ঝুলিয়েছে তালা।
বিপন্নতাই জীবন এখন
হাতে শুধু ভিক্ষার থালা।

বিদায়ের প্রাক্কালে

তনয়া মন্ডল
বাংলা সাম্মানিক (৩য় বর্ষ)

বিদায় বেলা প্রাণ নাই যেতে চায়
তবু যেতে হবে।
কে যেন ডাকে বারে বারে
এত দিনের এই পরিচয়
বিদায় বিদায় চির বিদায়।
নিলাম তোমাদের কাছে।
বিশ্ব মাঝারে পাড়ি যেথায়,
ছিলাম শেষে মাঝে।
বিদায় বেলায় মন নাহি যেতে চায় তবু
যেতে হবে সেথায়।
যদি কোনদিন ভুল করে থাকি,
পার যদি ক্ষমা করে দিও।
কভু যেন স্মৃতি ভুলে নাহি যাই,
কেন যে পৃথিবীতে এত ভালোবাসা।
ভুলতে নাহি পারি কোন কিছু।
তবু শেষ দিনে নিতে হবে বিদায়।
কেন যে কেঁদে ওঠে মন প্রাণ।
জন্ম আমার কোন লগনে ভাবি মনে তাই।

জানি না কোন পাপের ফলে,
সবই হারালাম ভাই।
আমি সে এক দুঃখি মানুষ
সেটা সবাই জানি।
আজ আমি পাই না খুঁজে,
মোর জীবনের মানে,
বিদায়ের আগে শুধু বলে যাই
সুখে থেকো ভালো থেকো ভাই।
মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি,
এই মহাবিদ্যালয়ে এসে।
স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে গেছে।
মহাবিদ্যালয়ের নাম।
দু-হাজার একুশ পেরিয়ে যাব,
দুঃখ সুখের পথে।
নতুন সূর্য উঠুক আবার নতুন দিনের প্রাতে।
তবে যাওয়ার বেলায় বলি, পারলে মনে রেখো
সুখে থেকো ভালো থেকো
এই করোনার মাঝে,
শুভ বিদায়টা তোমরাই দিও।

ভালবাসার শহর

দীপাশা দাস
এম. এ (১ম বর্ষ)

মনে করো আমি নেই বসন্ত এসে গেছে
তোমার হাতের আবিরে মেতেছে সেই লাল
পেয়েছে তোমার স্পর্শ
ছুঁয়েছে তার ঠোঁট চিবুক গাল।
ঝরা পাতাগুলো সামলাচ্ছে নিজেদের
বাঁধছে তাদের ঘর
তুমি আমি আলাদা
অথচ একই আমাদের শহর।
মনে পরে আজও আমায়?
ছেড়ে দিয়েছিলি সেই পথে!
ফিরে এসে দেখো
আজ বসন্ত ফোটে অন্য কারোর হাতে।
গঙ্গার পারে স্নিগ্ধ হাওয়ায়
মিশছে দুটো ঠোঁট
শত শত প্রেমের সাক্ষী
প্রাণের শহর কলকাতাই হোক।

আগে ও পরে

পল্লবী হালদার
(এম.এ, প্রথম বর্ষ)

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি
গরীব মরে লাট কলে,
মানুষ ঠকিয়ে যারা খায়
তাদের কথায় কি সমাজ চলে।
জানি শুয়োর কচু খায়
শুয়োর আবার এখন ড্রিংক করে,
কথায় কথায় গুণ্ডামি
সমাজ তবু কেন ভয় করে।
নিরক্ষরতার সমাজ ছিল
তখন ছিল না এতো রাজ,
সাক্ষরতায় বর্বরতা
দেখিয়ে ছিল এরা আজ।
ভ্রাতৃ প্রেমে চলতো সবাই
ভাবতো তখন সবার কথা,
এখন শুধু রংবাজি।
ভয় পায় শুধু আমজনতা।
স্বাধীন দেশটা আজ হলো পরাধীন
আবার ইংরেজ নামটা কি করে এলো,
নিজের অন্নে খেতে পায় না
সাত শকুনে ছিঁড়ে খেলো।
তবুও সবাই বলে ভালো আছি
তাহলে মনে মনে কেন প্রশ্ন হয়,
হায়রে সমাজ ঢেকে গেলি
আগের দিনের পরাধীনতায়।
বাঁচবি যদি সুভাষ হও, ধরো শক্ত হাতিয়ার
আমজনতা সবাই মিলে মুছে ফেলো কলি
পরাধীনতার।

অভিযোগ

প্রীতি মাকাল
প্রাক্তন ছাত্রী, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

জীবনে চলতে চলতে
একটা সময় আসে
যখন হার মেনে যায়
নিজে সবার কাছে
সারাটা দিন
যা কিছু করি, যা কিছু বলি
তা সমস্ত ভুল।।
মুহূর্তগুলি প্রতিটা আমার
ভরা অভিযোগে
ইচ্ছা জাগে হারিয়ে যেতে
কেউ যেন না খোঁজে।।
চেষ্টা করি মানিয়ে নিতে
নিজে সবার সাথে
মন না বুঝে সবাই আমায়
আবারও ভুল বোঝে।।
কিছু ভাবনার পর
ভেবে না পায় কূল
নিজের কাছে নিজের
পরিচয়
আমিই সেই ভুল।।

মায়ের অভিমান

রিঙ্কি মন্ডল
এম.এ (প্রথম বর্ষ)

মা তুমি কেমন আছো?
কতদিন আর থাকবে অসুস্থ তুমি?
কতদিন শুনিনি গল্প তোমার কাছে,
কতদিন যে হয় না কথা মা তোমার সাথে।
তোমার কাছে গেলে এখন সবাই দেয় বকা,
বলে- যাসনা বাইরে চলছে খুব খারাপ সময়
ওরা জানে না, তুমি তো আমার ভালো মা,
তোমায় ছাড়া যে আমি থাকতে পারি না।
জানে না ওরা তোমায় আমি কতটা ভালোবাসি
মা .. মা.. তুমি জানো? আমার মত কত ভাই বোনের
মুখে নেই অন্ন, নেই হাসি।
কত মানুষ যে বলছে তারা পাচ্ছে না খেতে,
তুমি আগে ঠিকই বলতে মা,
এদের জীবন যাবে শাস্তি পেতে পেতে,
এরা এতদিন বেশ ভালো ছিলো, কষ্ট দিত শুধু তোমায়
আজ তোমার একটু নীরবতায় কাটছে ওদের জীবন বিষণ্ণতায়।
কিন্তু মা, আর যে ভালো লাগে না, অনেক দিন হল পার
এবার সময় হয়েছে মা সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াবার।
তোমায় ছাড়া যে লাগে না আর ভালো
আর আসে না ঘুম চোখে
এখনো যে মা অনেক স্বপ্ন পূরণ বাকি
বাকি গর্বের সাথে হাঁটা তোমার বুকে।

হয়তো

শীলা বেরা
বি.এ প্রথম বর্ষ

একদিন শেষ হয়ে যাবে এই সবুজ বৃক্ষটি
ঝরে যাবে এর সুন্দর পাতাগুলি
শুকিয়ে যাবে ডালপালা
কোন এক কালবৈশাখি ঝড়ে
গোড়া থেকে ভেঙে যাবে গাছটিও !

রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট-এর আলোটিরও
হয়তো একদিন গ্যাস যাবে ফুরিয়ে
আলো যাবে নিভে।

সারিসারি বহুতলগুলি
এ'ও হয়তো যাবে ভেঙে একদিন
পুরোটাই হয়ে যাবে ধূলো।

শিশুটিরও হয়তো হাজার প্রশ্ন যাবে থেমে
সে যাবে একাই কোল থেকে নেমে।

তোমার ঘুন ধরা পাঁজরের
জোরও যাবে থেমে
তোমার প্রয়োজনও যাবে কমে।

আমার কলমটির কালি একদিন
হয়ে যাবে শেষ
তারপর দীর্ঘ অবকাশ
আমার ও লাগবে বেশ।

যুদ্ধ

সম্বিত বোস
এম. এ (১ম সেমিস্টার)

যুদ্ধ জানে রক্তের কত দাম
কত জীবনের ইতিহাস হয় না লেখা।
হারিয়ে গেছে কোন বুলেটের পরে
হয়নি সাধের স্বাধীনতাখানি দেখা।

ভৈরবী রাগ মেশিনগানের বুলেট
কাব্য লেখে ছিন্নভিন্ন মাথা।
সৈনিকরাও কবির বর্ম পরে
বুলেট আঁকে কবির কাব্য খাতা।

অনাহারী প্রাণ যেথায় সেথায় থাকে
নিলাম হয়ে যায় কত সম্মান।
যুদ্ধ সেসবের সাক্ষী থাকে তবু
যুদ্ধ আজও শোনায় নিজের গান।

সে গানে কত চিৎকার ভেসে আসে
সে গানে কত পেটের দায়ের কান্না।
তবু সে গান আজও শোনা যায় ধরাবুকে
সে গান আজও ভালো লাগে কারুর তাই না?

হয়তো প্রশ্ন সত্যি কথাই বলে
নয়তো কেন পুনরায় হয় যুদ্ধ?
কবির কলম বুলেটের সামনে বিকল
তবু কলমেই হোক যুদ্ধ অবরুদ্ধ।

দিনচরা-রাতচরা

সন্বিত বোস
স্নাতকোত্তর, বাংলা (১ম সেমেস্টার)

বিকেল আলো নিভে আসে সন্ধ্যার আলোয়ানের নীচে
শ্রান্ত শহর বাড়ি ফেরে।
বাড়ি ফেরে একরাশ গল্পের দল
যারা নিজেদের সাজিয়েছে সারাদিন ধরে
মুহূর্তের কাজল, সাফল্যের ঠোঁট পালিশ আর ঘুরে দাঁড়ানোর রোজ পাউডারের নীচে।
সন্ধ্যে নামে তারাদের চাঁদোয়া শহর দেখে।
আঁধার শহরের অন্ধকার গলিগুলোতে জ্বলে ওঠে রাত্রি শহরের উদ্দাম জনজীবন।
শহর চলে।
এক গুচ্ছ গল্পেরা যখন তাদের শোনাতে ব্যস্ত ক্লান্ত দিনচরাদের।
তখন রাতচরাদের গল্পেরা নিজেদের সাজাচ্ছে।
তাদের কাছে নেই কোনো সাজ।
তাদের গল্প কেবল ছেঁড়া জামা ছেঁড়া শাড়ি আর পেটের দায় চেনে।
রাত শেষ হয় দিনচরাদের আনাগোনা বাড়ে।
কিন্তু বইয়ের ভাঁজে রাতচরাদের গল্প শোনে না কেউ।
পেটের দায়ে আর ছেঁড়া শাড়ির ভাঁজে গল্পেরা ঘুরে বেড়ায়।
গল্পের জন্ম হয়ে, বাড়ে তারা, কিন্তু শেষ হয় না তাদের।
দিনচরা আর রাতচরাদের মাঝে গল্পেরা ঘুরে বেড়ায়
তাদের শুধু চেনে শহর।

একুশে বর্ষা

সুজাতা দাস
পি.জি বাংলা (১ম সেমিস্টার)

পায়ে পা মিলিয়ে চলেছে বর্ষা
গ্রীষ্ম থেকে শীত নেইকো ভরসা।
সকাল-দুপুর -বিকেল ঝরেছে অঝোরে
নেই কোন সীমা তার বিস্তৃত নজরে।
কত গ্রাম কত বাড়ি ভেসেছে ভেলায়
চলেছে নদীর বুকে ঠাঁই নাই মেলায়।
কখনো ঝিরিঝিরি কখনো মুষলধারে
নেমেছে বর্ষা সকল বাঁধা তুচ্ছ করে।
স্রোতের কোলাহলে যখন ছাপিয়ে যায় কূল
বর্ষা তুই আর ঝরিসনে এবার হ নির্মূল।

স্বপ্নরাজ্য

অনামিকা আদক
স্নাতকোত্তর, (প্রথম সেমেস্টার), বাংলা বিভাগ

মাথার মধ্যে হাজার হাজার ভাবনা কিলবিল করছে সারাদিন ধরে। জানি না কী তাদের উদ্দেশ্য! নিজেকে নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক মতন। আচ্ছা, আমাদের পাওয়া না-পাওয়াগুলো কি? সত্যিই আমাদের হাতে? নাকি পাওয়াগুলোকে ভুলে, না পাওয়াগুলোকে নিয়ে নিরন্তর লড়াই? তাই যদি হয়, এমন কী বা হারানোর ভয় আমার? যেটুকু জীবনের থেকে পেলাম এটা কম কিছু তো নয়। না। এই ছেলে-ভোলানো সান্ত্বনাটাকেও আজ কেমন করুণা হচ্ছে মনে মনে। কাউকে যদি বেশি আপন ভেবে নিজের মধ্যেকার দমচাপা কষ্টগুলো উজাড় করে দিতে চাই, সেও কি সত্যি সেগুলোকে সাদরে পুরস্কারের মতন গ্রহণ করবে? নাকি পায়ের চাপে থেঁতলে দেবে? কিংবা, করুণার চোখে দেখবে শুধুই। ধরা যাক, সে আমাকে একটুখানি বাঁচিয়ে দিতে গিয়ে আমার সব খারাপটুকু মেনে নিল নিজের দুই গালে কালিমার মতন।

আর ঠিক তার পরেই ....

সে হারিয়ে গেল।

না না না ...

অন্য কিছু ভাবতে হবে।

মাঝে মাঝে আমার সাধ হয় হারিয়ে যেতে। ''হারিয়ে যাবো দূরে কোথাও, কেউ খুঁজে পাবে না।'' নিজের এই হারিয়ে যাবার ব্যাপারটা ভাবলেই অ্যাডভেঞ্চারাস লাগে। কিন্তু ভয় তখনই হয়, যখন অন্য কেউ হারিয়ে গিয়ে আমাদের একা করে দেয়। একেবারে একা।

আচ্ছা, আমি যদি কোনদিনও হারিয়ে যাই কেউ কি সত্যিই আমায় খুঁজবে?

তার উত্তর হবে স্বাভাবিকভাবেই হ্যাঁ। কিন্তু, খুঁজতে খুঁজতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন আমি স্মৃতিতে পরিণত হব।

রাতে আর আগের মতো ঘুম আসে না।

কী জানি তারও বোধ হয় সাধ হয়েছে হারিয়ে যাওয়ার। সে যাক, তবে, রাতের অন্ধকার আমার তেমন ভালো লাগে না।

কেমন একটা মরচে-ধরা অতীতের মতন। একটা গন্ধ আছে। তবে সেই গন্ধে সুখ নেই, সুবাস নেই। শুধুই একঘেয়েমির মতো।

আচ্ছা, রাতেরও তো একটা সৌন্দর্য আছে, মায়াবী চাঁদ আর তারাদের মিছিল আছে, তারপরও আমি কেন সেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে অক্ষম? তবে কি আমার ভয় হয়? ভয় হলেও কীসের এতো ভয়? ভয়টা অন্ধকারকে না কি অন্ধকার ঘরটাকে? না কি ওই ঘুমাচ্ছন্ন পৃথিবীটাকে? তারা কি আমার গলায় সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে দম বন্ধ করে হত্যা করতে চায়? ভেবেছিলাম জেগেই যখন আছি সূর্যোদয়টা দেখেই ঘুমোতে যাব। তা আর হল কোথায়? ঘুমবাবাজি এসে বিরাজিত হলেন চোখের পাতায়। শান্তির ঘুমের মতোই। তবে, স্বপ্নরাজ্যেও যানজট, এবার সত্যিই অন্যকিছু ভাবতে হবে।

তারাক্ষেত্রে রঞ্জন

অভিপ্রিয় ভুঁইঞ্যা
এম.এ (প্রথম সেমিস্টার)

আজ রঞ্জনের খুব মজা, কারণ এবারে জন্মদিনে তারা ঘুরতে যাবে। যদি কোথায় যাবে সে এখনও জানে না। আর এই জন্মদিনে তার উপরিপাওনা তার ভালোদি আসছে। এই ভালোদি আসলে রঞ্জনের মাসি হয় কিন্তু বয়সে সাত-আট বছরের বড় বলে রঞ্জন ভালোদি বলেই ডাকে। এই ভালদি-র কাছেই তার যত আবদার। তাই আজ ব্রেকফাস্টের টেবিলে এই খবরগুলো শোনার পর তার আর বাড়িতে মন টিকছিলো না। সে কখন স্কুল থেকে এসে নিজের প্যাকিং করবে সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিল। তাই আটটা বাজতেই স্নান করতে চলে গেল। বাথরুমে ঢুকতে যাবে এমন সময় রঞ্জনের মা পেছন ডেকে বলল, '' কী রে রঞ্জন তুই আজকে এত তাড়াতাড়ি স্নান করতে যাচ্ছিস। তোর পড়া হয়ে গেল? তোর ইউনিট টেস্টের রেজাল্ট বেরোনোর কথা ছিল না গতকাল, কত পেলি?''

রঞ্জন আমতা আমতা করতে করতে বলল, ''হ্যাঁ, মানে ওই বেরিয়েছে, মানে বেরোয়নি।''

রঞ্জনের মা বলল, ''সত্যিটা বল কত পেয়েছিস?''

রঞ্জন ভয়ে ভয়ে বলল, ''ওই বাংলায় ৮৪, ইংরাজিতে ৭৩, ইতিহাসে ৮৩, ভূগোলে ৭৮, লাইফ সায়েন্স এ ৭১, ফিজিকাল সায়েন্স-এ ৬৪, ই.ভি.এসে ৩৬/৫০।''

মা বললেন, ''আর অঙ্কে?''

'অঙ্কের খাতা তো এখনও বেরোয়নি। অঙ্কের সুকমল স্যার ঘুরতে গেছেন।''

বাবা বললেন, '' সত্যি বলছিস তো বাবু, সত্যিই খাতা বেরোয়নি? তারপর দেখবো সেই খাতা তোর বিছানার তলায় পাওয়া গেছে। ভুলে যাস না ক্লাস এইট থেকেই কিন্তু রেজাল্ট কাউন্ট হয়।''

রঞ্জন আর বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার চালিয়ে রঞ্জন ভাবতে লাগল স্কুলে যাওয়ার আগেই অঙ্কের খাতাটা সরাতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি স্কুল ড্রেস পরে আগেভাগে অঙ্কের খাতাটা ব্যাগে নিয়ে নিল। এবং ভাত খেয়ে বাবার অফিস বেরোনোর আগেই বেরোতে যাবে এমন সময় মা পেছন থেকে ডেকে বলল, ''দাঁড়া। বাবার সাথে পাড়ার মোড় অবধি যাবি তো?''

রঞ্জন বলল, ''না মা, এইটুকুনি তো রাস্তা আমি পারব, আর স্কুল বাসের টাইমও হয়ে গেছে।''

বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির পেছনে বাগানে মা-র সদ্য বসানো গোলাপ গাছের তলায় অঙ্কের খাতাটা পুঁতে দিল।

সেদিন স্কুলে পৌঁছেই রঞ্জন শুনল এই ছুটিতে ক্লাসের সকলেই প্রায় ঘু রতে যাচ্ছে। কেউ ইউ.এস, কেউ সিঙ্গাপুর, বদমাস শেখরটা পর্যন্ত ঘুরতে যাচ্ছে স্পেনে ভাবা যায়। রঞ্জনের মনে হল তারা কোথায় যাচ্ছে জেনে এলে ভালো হত, তাহলে সেও শুনিয়ে বলতে পারত। সারা কাঁধে হাত দিয়ে বলল, ''শোন আমরা রাজস্থানে যাচ্ছি। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করব। লাইক দিবি। তা তোরা কোথায় যাচ্ছিস।''

রঞ্জন বলল, ‘‘এই রে, তা তো জানি না।’’

সারা বলল ‘‘ঠিক আছে, পৌঁছে ফোন করব, তুইও পোস্ট করিস।’’

রঞ্জন ভাবল, ‘‘ইস্ কী ভুল করলাম, আজ সারার কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল।’’

স্কুল ছুটি হতেই বাড়ি এসে রঞ্জন দেখে ভালোদি চলে এসেছে। ছুটে গলা জড়িয়ে ভালোদির আদর খেতে খেতে রঞ্জন বলল, ‘‘তুমি কখন এলে?’’

‘‘এই তো দু-তিন ঘন্টা হল।’’

‘‘আমরা কোথায় যাব।’’

‘‘তারাপীঠ’’

রঞ্জনের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ার মত অবস্থা। রঞ্জন বলল, ‘‘মানে! আমরা তারাপীঠ যাচ্ছি! আমার বন্ধুরা সব কত ভালো ভালো জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছে সেখানে আমরা কোন হদ্দ গ্রামে ঘুরতে যাচ্ছি।’’

মা বললেন, ‘‘চুপ কর, হদ্দ গ্রাম মানে, আগের বছর তোর শরীর খারাপ হল, আমি মানত করেছিলাম, তা মা আমার মানত রেখেছে। আমি যাব না?’’

রঞ্জনের মন পুরো ভেঙে গেল, ভেবেছিল ভালোদির সাথে খুব মজা করবে। ঘুরতে যাওয়ার সব ফটো বন্ধুদের দেখাবে। মনে মনে রঞ্জন ভাবল, ‘‘ধুর সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল।’’

ভালোদি বলল, ‘‘এত দুঃখ পাওয়ার কি আছে, তুই তো এখানেও কখনও যাসনি। ট্রেনে যেতে যেতে এই তারাপীঠ সম্বন্ধে অনেক গল্প বলব। দেখবি তোর ভাল লাগবে।’’

রঞ্জন রেগে বলল, ‘‘আমি এই সব কুসংস্কার অলৌকিক কাহিনীতে বিশ্বাস করি না।’’ বলে জামাকাপড় চেঞ্জ করতে ঘরে চলে গেল।

বাবা রাত আটটায় অফিস থেকে চলে এল। নটার মধ্যে সকলেই রেডি হয়ে ট্যাক্সিতে মালপত্তর নিয়ে উঠে পড়ল। বাবা বলল, ‘‘আচ্ছা, ট্রেনের টিকিটটা কার কাছে আছে?’’

ভালোদি বলল, ‘‘ আমার কাছে আছে স্টেশনে গিয়ে দিচ্ছি।’’

রঞ্জন ট্যাক্সিতে পুরো সময়টাই জানলার বাইরে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল। একবারও ভালোদি বা মা-র সাথে কথা বলল না।

নির্দিষ্ট সময় স্টেশনে ট্রেন এল। ট্রেনের নাম ছিল গৌড় এক্সপ্রেস। ওদের অবশ্য রিজার্ভ সিট ছিল। চারজনের জন্য চারটে ওপর নীচে একে অপরের বিপরীতে শোয়ার চওড়া সিট ছিল। রঞ্জন আগে গিয়ে ওপরের সিটে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে মা ও ভালোদি খেতে ডাকল, এদিকে রঞ্জনেরও খুব জোর খিদে পেয়েছিল, তাই বাধ্য হয়ে খেতে নামল। খাবার অবশ্য ভালই ছিল লুচি, ছোলার ডাল, মিষ্টি। মা-র হাতে বানানো খাবার সবসময়ই ভালো হয়। খেতে খেতেই ভালোদি তারাপীঠ সম্বন্ধে বলতে শুরু করল, ‘‘ এই তারাপীঠ হল বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার সদর রামপুরহাট শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে তারাপীঠ

থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম। এটি দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত। কিছুকাল আগেও বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। তবে বর্তমানে তীর্থ মাহাত্ম্যের কারণে প্রচুর জনসমাগম হওয়ায় স্থানটি ছোটখাটো শহরের আকার নিয়েছে। এই তারাপীঠের পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, দেবী সতীর তৃতীয় নয়ন বা নয়নতারা পড়েছিল এই তারাপুর গ্রামে। পরে এটি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ঋষি বশিষ্ঠ প্রথম এটি দেখতে পান এবং দেবী তারা রূপে রূজা করেন। তবে এই লোককথার পিছনে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও আছে। বিনয় ঘোষের মতে পালযুগে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের সাথে সাথে বাংলায় বৌদ্ধ দেবী তারার সাধনা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের উত্থানে বৌদ্ধদেবী হিন্দুদেবীতে পরিণত হয়। মনে করা হয় রসায়নাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে দেবী তারার সাধন পদ্ধতি নিয়ে আসে ভারতে এবং লোককথায় এই নাগার্জুনই বশিষ্ঠ মুনিতে পরিণত হয়।”

এই সব শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল রঞ্জন তার ঠিক মনে ছিল না। যখন ঘুম ভাঙল দেখল, জানলার বাইরের পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ইঁট, কাঠ, পাথরের ঘরবাড়ি সরে গিয়ে বিঘের পর বিঘে খোলা ধানজমি, কখনো খোলা মাঠ, পুকুর, খাল, গোরু, বাছুর। এছাড়া সকালও হয়ে গেছে, তার সাথে সাথে রঞ্জনের রাগ পড়ে গিয়ে মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে গেছে।

ট্রেন থামল বোলপুর স্টেশনে। সেখানে কয়েকজন ঝালমুড়ি, জল, চিপস, মটর বাদাম আর কত কিছু বিক্রি করছে। রঞ্জনরা জলটাই কিনল। সেই স্টেশনে অনেকে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর ট্রেন চলতে শুরু করল এবং ট্রেন থামল একেবারে রামপুরহাট জংশনে। সেখানেই রঞ্জনরা নামল। নামতেই দেখা গেল ট্রেনের অনেক প্যাসেঞ্জার ‘জয় তারা’ ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। রঞ্জনরা চলল লজের দিকে। তারা উঠল নীলমাধব লজে। রিসেপশনে গিয়ে বাবা মুকুন্দবাবুর খোঁজ করতেই, রিসেপশনিস্ট, ‘‘ওয়েট আ মিনিট” বলে ল্যান্ডলাইন -এ কাকে কল করল এবং মিনিট পাঁচেক পর ডান দিকের লিফট থেকে এক পাঁচ ফিট উচ্চতার মধ্য বয়স্ক ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। এসেই ‘ধারে সুবোধ কতক্ষণ এলি” বলে রঞ্জনের বাবা আর লোকটা দুজনে আলিঙ্গন করল।

লোকটা রিসেপশনে বলে দিল এদের ডাবল বেডের দুটো রুম দিয়ে দাও। মুকুন্দবাবু বললেন, ‘‘এখন কি স্নান করবি আর ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দেব?”

বাবা বললেন, ‘‘ আরে ব্যস্ত হতে হবে না, স্নান করলে বলব, তবে তুই এখন ব্রেকফাস্টটা পাঠিয়ে দে। বাবা একে একে লোকটার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

লোকটা রঞ্জনকে দেখে বললেন, ‘‘ব্যাপি বার্থডে রঞ্জন। আমি কিন্তু তোমার বাবার কাছ থেকে সব শুনেছি। আমি হলাম তোমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু, যাকে বলে গলায় গলায়। তোমার রাগ ভাঙানোর উপায় আমার কাছে আছে, তোমাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যাব।”

মা বললেন, ‘‘চলো রুমে যাওয়া যাক।”

রুমে ঢুকেই বাবা, মা ও ভালদি সবাই বার্থ ডে উইশ করল। মা বললেন, ‘‘বাবু রাগ করিস না, এ

বছরটা কেক ছাড়াই সেলিব্রেট করে নে, পরের বছর ভালো করে পালন করব।”

ফ্রেশ হওয়ার আধঘন্টা পরে একটা লোক এসে চা, কফি ও জলখাবার দিয়ে গেল। লোকটা বেরিয়ে যাবে এমন সময় বাবা বলল, “আচ্ছা মুকুন্দবাবুকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।”

‘‘জি আজ্ঞে” - লোকটি বলল।

দশ মিনিট পরে মুকুন্দবাবু আসতেই বাবা বললেন, ‘‘আচ্ছা আজকে পুজো দিতে একটা দোকান ঠিক করে দিস তো।”

মুকুন্দবাবু বললেন, ‘‘আজকে পুজো দিতে হলে কিন্তু একটু ঝক্কি পোহাতে হবে। কারণ আজকে অমাবস্যা। আজ মন্দিরে প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে। তিলধারণের জায়গা থাকেনা, তবে চিন্তা করিস না, আমি লোক ঠিক করে দিচ্ছি। সে তোকে আরামে মন্দিরে পুজো দিয়ে বের করে আনবে।”

সেইমতো রঞ্জনরা সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে স্নান সেরে জামাকপড় পরে মন্দিরে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পরল। এদিকে যারা সোশাল মিডিয়ায় কত সুন্দর সুন্দর জায়গার ছবি দিচ্ছে। যাই হোক পুজো দিতে মুকুন্দবাবু একটা মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে একজন পুরোহিতের সাথে দেখা করিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন,‘‘এদের একদম আরাম করে পুজো দিয়ে দেবে তো।” পুরোহিত সেই মতো রঞ্জনদের প্রথমে হাত, পা, ধুইয়ে পাঁচশ এক টাকার ডালা নিয়ে রওনা দিলেন। ঠাকুরমশাই আমাদের প্রথমে জীবিত কুণ্ডের কাছে নিয়ে গেলেন।

তখন ভালোদি বলল, ‘‘শোন রঞ্জন কথিত আছে এই জীবিত কুণ্ড নাকি বড় অলৌকিক। নাকি এই পুকুরে মৃত প্রাণী পড়লে জীবিত হয়ে ওঠে।”

রঞ্জন বলল, ‘‘যত আজগুবি কুসংস্কার।”

পুরোহিত বললেন, ‘‘সবাই কুণ্ডের জল মাথায় ছিটিয়ে নিন।” তাই নেওয়া হল।

এরপর পুরোহিত বলল, ‘‘ বলুন জেনারেল লাইন দেবেন না ভি.আই.পি লাইন। ভি.আই.পি-তে পাঁচশো ও হাজার টাকার লাইন আছে।” রঞ্জন বলল, ‘‘টাকা নিয়ে কেন পুজো দেব, জেনারেলেই যাব।” বলে হাঁটা দিল, অমনি ঘাটে পা স্লিপ করে মুখ থুবড়ে পড়ল। মাথায় আর হাতে খুব জোর লাগল।

মা বলল, ‘‘না না, ভি.আই.পিতে লাইন দাও, মা বুঝি চান না।”

এরপর রঞ্জনরা ভি.আই পি লাইনে পুজো দিতে গেল, কিন্তু সেটাও জেনারেলের থেকে কিছু কম ছিল না। একটা ছোট সমুদ্র। তিনঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর অবশেষে গর্ভগৃহের সম্মুখে আসা গেল। সেখানে তিনটি লাইন নদীর ত্রিবেণী সঙ্গম হয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজায় এসে মিলিত হয়েছে। সেই তিন নদীর মোহনার স্রোতে একে অপরের হাত ধরে কোনক্রমে নিজেদেরকে রঞ্জনরা বাঁচিয়ে মন্দিরে ধাতব মা তারার মূর্তির কাছে পৌঁছল। মন্দিরে পুরোহিতের মন্ত্র পড়া শেষ হতেই কোনক্রমে মন্দির থেকে বেরিয়ে যেন রঞ্জনরা প্রাণে বাঁচল।

লজে এসে রঞ্জনরা দুপুরের খাবার খেয়ে রুমে যাবে ভাবছে এমন সময় মুকুন্দবাবু এসে রঞ্জনকে

বললেন, ''আজ তো একটু পরেই বিকেল হয়ে যাবে, এখানে রাস্তার আলো বিশেষ নেই। তার থেকে কাল সকালে তোমাকে আঁটলা গ্রামে বামদেব ঠাকুরের বাড়ি নিয়ে যাব, চন্দ্রচূড়ের মন্দির, কঙ্কালিতলা, আর তোমরা একদিন থাকলে তো বোলপুর শান্তিনিকেতনেও ঘুরে আসতে পারবে। তবে হ্যাঁ কখনও ভুলেও শ্মশানের দিকে সন্ধের পর যেও না। জানো তো আজকে শ্মশানে স্বর্গ ও নরকের দ্বার খুলে যায়। বুঝলে রঞ্জনবাবা।''

ব্যস তখনই রঞ্জনের আরো জেদ চেপে বসল আজই সে সন্ধের পর শ্মশানে যাবে। সেখানে গিয়ে সেলফি তুলে স্কুলের বন্ধুদের প্রমাণ করে দেবে সে কত সাহসী। তারা যেখানে ঘুরতে এসেছে সেটাও নেহাত কম হেলাফেলা নয়।

এরপর মা আর ভালোদি, বাবা যেই রুমের দিকে হাঁটা দিয়েছে রঞ্জন সুযোগ বুঝে লজের মেন গেট থেকে বেরিয়ে সোজা মন্দিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। রঞ্জন আগেই দেখে রেখেছিল মন্দির বাঁদিকে রেখে ডানদিকের পথ ধরে হাঁটলেই শ্মশানের পথ পাবে। একসময় দেখতে পেল পায়ের তলার শক্ত বাঁধানো জমি শেষ হয়ে শুরু হয়ে গেছে লাল মাটির জমি, যার মধ্যে মেশানো আছে বালি আর ছাই। রঞ্জন হাঁটতে শুরু করল, যেন এতক্ষণ সে এরজন্যেই অপেক্ষা করছিল। এক অমোঘ আকর্ষণ যেন তার দুপা ধরে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অমবস্যার রাতে শ্মশান প্রায় পুরোই অন্ধকার, শুধু দূরে দোকানের আলোর আভা এসে পড়েছে শ্মশানের মাটিতে। দূরে দোকান, মন্দির যেন এক অন্য পৃথিবী আর এখানে শ্মশান যেন নির্জন, নীরবতায় পূর্ণ। রঞ্জন হেঁটে চলেছে, সে জানে না কোথায় যাচ্ছে কিন্তু সে চলেছে। তার পা, হাত শরীরের সমস্ত অঙ্গ জানে তার গন্তব্য শুধু মাথা জানে না। হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল শ্মশানের কিছুটা জুড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে কিছুদূর অন্তর অন্তর লাল বস্ত্র পরিহিত কিছু তান্ত্রিকের দল পূজা সামগ্রী নিয়ে হোমযজ্ঞ করে দেবী তারার পূজায় রত। এবং তাদেরকে বেষ্টন করে কিছু ভক্তমণ্ডলী জোড় হাতে বসে আছে আর ''জয় তারা' ধ্বনি দিচ্ছে। তাদের ছাড়িয়ে রঞ্জন হাঁটতে লাাগল দূরে গভীর জঙ্গলের দিকে। ঠিক জঙ্গল কিনা সে বুঝতে পারল না। যত এগোতে লাগল সামনের অন্ধকার ঘোর থেকে ঘোরতর হতে লাগল। শুধু দূরে চিতার আলো মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করতেই নিজেকে যেন হালকা মনে হতে লাগল রঞ্জনের। একবার মনে হল মা বাবার কাছে লজে ফিরে যাই কিন্তু পরক্ষণেই রঞ্জন সব ভুলে আবার সামনের দিকে এগোতে থাকলো। কিছুটা এগোনোর পরেই রঞ্জন দেখল সামনের জঙ্গল হালকা হতে হতে আবার শ্মশানের জমি দেখা দিয়েছে। আর বাঁ দিক দিয়ে চলে গেছে এক লম্বা গভীর খাল, যার কলো জল সহসা দেখলে মানুষের মনে বিষাদ ও বেদনার সৃষ্টি করে। যেতে গিয়ে রঞ্জনের মনে হল সে যেন আর যেতে পারছে না। সামনে দিয়ে যেন কতগুলো মানুষের ছায়া যাতায়াত করতে লাগল কিন্তু সে কাউকেই দেখতে পেল না। তবে তারা যেন অনবরত ফিসফিস করছে। হঠাৎই রঞ্জন দেখল তার থেকে এক হাত দূরে দেড় হাতের লম্বা কালোর ওপর সাদা ছিটের দেখতে সাপ চলে গেল। আর কিছুক্ষণ অন্তরই শেয়ালের আওয়াজ ও অচেনা এক নিশাচর প্রাণীর বিকট ডাক কানে আসছিল। রঞ্জনের মনে হচ্ছিল ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে গেছে।

এমন সময় রঞ্জন দেখল দূরে এক চকচকে আলো সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমশ রঞ্জনের শরীরের হালকা ভাবটা কমতে শুরু করল। সেই আলোটা সামনে আসতেই সেটা একটা গলার হারের লকেট। সামনে এলেও চারিদিকের অন্ধকারে কে এসেছে তার মুখটা বোঝা গেল না। কে আসছে সেটা দেখতে গিয়ে রঞ্জন প্রথমে বুঝতে পারেনি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কী রকম পরিবর্তন ঘটেছে চারিদিকের সেই অশরীরী ছায়াগুলো আর নেই এমনকি তাদের ফিসফিসানিও নেই। সেই নিশাচর প্রাণীর অদ্ভুত আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে। শেয়ালের আওয়াজও অনেকটা কমে গেছে। রঞ্জনের ভয়ের সিংহভাগ কমে গেল যখন সেই ব্যক্তির গলার আওয়া শুনতে পেল।

অস্পষ্ট ব্যক্তিটি বলল, ‘কি রে রঞ্জন তুই এখানে কেন একাই এসেছিস। দিদি বলেছে না একা একা কোথাও যেতে না। কেন তুই লজ থেকে একা বেরিয়ে এসেছিস। জানিস তোর মা কি চিন্তায় আছে? চল এখান থেকে।”

রঞ্জন বলল, ‘‘ভালোদি!”

ভালোদির রঞ্জনকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল লজের দিকে। রঞ্জন দেখল সে ভালোদির হাত ধরে হাঁটছে আর তার চারিদিকের পরিবেশ মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দ্বারকানদী পার হয়ে তাদের লজের কাছে পৌঁছে গেল। লজের কাছে পৌঁছে ভালদি তার গলা থেকে গলার হারটি খুলে রঞ্জনের হাতে দিল। রঞ্জন দেখল সেই রূপোর হারে একটা ‘তারার লকেট”। দিয়ে বলল, ‘‘যখনই বিপদে পড়বি এটা হাতে নিয়ে আমায় স্মরণ করবি।”

কথা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে রঞ্জনের মা -এর আওয়াজ এল। ‘‘বাবু তুই এখানে! তুই কোথায় চলে গেছিলি আমাকে না বলে?” বাবা রঞ্জনকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

মুকুন্দবাবু বাবাকে বললেন, ‘ধযাই হোটেলের স্টাফদের বলে আসি আর খুঁজতে হবে না, ছেলে পাওয়া গেছে।”

ভালোদি লজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ‘‘কী রে তুই একা কোথায় চলে গেছিলি?”

রঞ্জন বলল, ‘‘মানে! এই তো তুমি আমার সাথে ছিলে”।

মা বলল, ‘‘কী বলছিস বাপ, ও তো আমাদের সাথেই ছিল। তুই কি ভুলভাল বকছিস।” রঞ্জনের মা রঞ্জনকে ডাকতে থাকে, রঞ্জন ....

রঞ্জন ঘুম ভেঙে দেখে ভোর হয়ে গেছে এবং পাশে মা বসে তাকে ডাকছে। সে নিজের ঘরে শুয়ে। মা-এর হাতে একটা পরীক্ষার খাতা। রঞ্জন ঘুম চোখে চশমা পরে নিয়ে বলল,‘‘ওটা কী?”

রঞ্জনের মা বলল, ‘‘ওটা কী মানে। এটা তো আমারও প্রশ্ন। গোলাপ গাছের তলায় এটা কেন রাখা ছিল। আজকে মাটি খুঁড়িয়ে সার দিতে গিয়ে দেখতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট টেবিলে এস, বাবা তোমার সাথে কথা বলবেন।”

মৃত্যুগামী বাস

মৌমিতা কর্মকার
এম. এ (প্রথম সেমিস্টার)

এবছরে অঘ্রাণেও হঠাৎ নিম্নচাপের আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির সাথে ঠান্ডা হাওয়া বাড়ি বসে ভালো লাগলেও যাদের বাইরে যেতে হচ্ছে তাদের কাছে কিছুটা বিরক্তির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আবহাওয়াটা। বৃষ্টির সাথে মাঝে মাঝে ঝোড়া হাওয়াও বয়ে যাচ্ছে তাতে ঠান্ডাটা আরো জোরালোভাবে লাগছে। পরদিন রবিবার হওয়ায় অফিসের কিছু দরকারী কাজ গুছিয়ে বেরোতে বেরোতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল নিলয়ের। সকালে অফিসে আসার সময় মোটরসাইকেলের সমস্যা হওয়ায় অগত্যা বাসে করেই আসতে হয় তাকে। বিরক্তি মনে কথাটি ভাবতে ভাবতে বাসস্টপের দিকে হাঁটতে থাকে সে। আসতে আসতে সে লক্ষ্য করে রাস্তা পুরো সুনশান। দু-চারটে যাওবা মোটর সাইকেল চলতে দেখেছিল বাসস্টপে এসে, এখন তাও দেখা যাচ্ছে না। কিভাবে ফিরবে তা ভাবতে ভাবতে ফোন বের করে নিলয়, এমনই কপাল চার্জ না থাকায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই মাথায় আসে না তার। মনে মনে ভাবতে থাকে আবার কি অফিসে ফিরে যাবে কিন্তু গিয়েও বা কি করবে ভেবে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর একটি বাস আসতে দেখে সেটিতেই উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। বাসটি তার গন্তব্যস্থল অবধি গেলেই হল তারপর কোনো না কোনো বাস বা ট্যাক্সি ঠিক জোগাড় করা যাবে এই ভেবে সে উঠে পরে। তাকে নিয়ে মোট দশজন যাত্রী বাসে। সারাদিন ক্লান্তির পর বাসে বসতেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরে সে। তার ঘুমটা ভাঙে এক জোরালো ধাক্কায়। নিজেকে সামলে ঘড়ির দিকে তাকাতেই সে দেখে ১২;৫৫ বাজে। শুরুতে বেশ দ্রুতই চলছিল বাসটা এখন আরো দ্রুত চলছে। সে চালককে আসতে চালাতে বললেও বাসের অন্য কোনো যাত্রীরা কিছুই বলে না। কেমন অস্বাভাবিক লাগে তার। আসতে আসতে ভয় করতে থাকে নিলয়ের। সে কন্ডাক্টর ও চালককে বাস থামাতে বললেও তারা থামায় না, রেগে গিয়ে সে কন্ডাক্টরের দিকে এগিয়ে তার কাঁধে হাত দিতেই নিলয় তার মেরুদন্ডে এক ঠান্ডা স্রোত নেমে যাওয়া অনুভব করে। কন্ডাক্টার যখন তার দিকে ফেরে তখন দেখা যায় তার মাথার ডানদিক থেকে রক্তের স্রোত গড়িয়ে নামছে নীচে। সে লক্ষ্য করে বাসটা সামনের এক ফ্লাই ওভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে, এবং নীচে রেললাইন। হঠাৎ তার মনে পরে ৩ সপ্তাহ আগে পেপারে পড়া খবরটার কথা একটি বাস ব্রেকফেল করে ৭জন যাত্রীসহ একটি ফ্লাইওভার থেকে নীচে ট্রেনলাইনে পড়ে যায় এবং সকলেই নিহত হয়। পরের সপ্তাহে সেই ট্রেনলাইনে আর ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। ফ্লাইওভারের নাম আর ভাবতে পারে না সে। হঠাৎ তার মাথায় তীব্র ব্যথা অনুভব হয় এবং তার সাথে সাথে তার দেহ শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে শীতল থেকে আরো শীতল হওয়া শুরু করে।

এক জোড়া জুতো

মৌসুমী ভৌমিক
বাংলা বিভাগ, এম. এ (চতুর্থ সেমিস্টার)

গল্পটা তনিমার মুখে শোনা। তার জবানীতেই লেখা -
আমি তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। দিনটি ছিল বর্ষাকালের দিন। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে বজ্রপাত সহ। প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ভয়ে দাদুর কোলের কাছে আশ্রয় নিলাম। সেই বৃষ্টির রাতে দিদা রুটি আর আলুর দম রাঁধলো। সবাই মিলে খেতে যাবো এমন সময় দেখি ল্যাম্পে কেরোসিন তেল নেই তাই বাতি নিভে যাচ্ছে। ল্যাম্পটা নিচু করে ধরে রেখে যে আলো জ্বলছিল সেই সামান্য ক্ষীণ আলোতে কোন রকম খেয়ে উঠলাম। তারপর সেই বৃষ্টির রাতে টান টান করে ঘুম দিলাম। সকালে উঠে দেখি দিদা ছড়া দিচ্ছে আর বাসি ঘরের কাজ সারছে, দিদি পড়ছে আর দাদু মাঠে গেছে। ভাবছো যে সবার কথা তো বললাম কিন্তু মা বাবা? আমার বাবা থেকেও নেই আর রইল বাকি মা, আমরা যখন খুব ছোট দিদি চার বছরের আর আমি এক বছরের তখনই আমার মা আমাদের মুখে দুবেলা অন্ন তুলে দেবার জন্য মাত্র ২০০ টাকার কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। কারণ বাবা আমাদের ছেড়ে অন্য জায়গায় নতুন সংসার পেতেছে। কাকু তখন কলেজে বি.এ দ্বিতীয় বর্ষের পড়াশোনায় রত।
বর্ষায় মাঠ-ঘাট পুকুর কানায় কানায় জলে পরিপূর্ণ। চাষিরা তাদের ধান চাষ শুরু করে দিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই মাঠের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সবুজে ভরে উঠল। সন্ধে হওয়ার আগে ঠিক গোধূলি সেই সময় কেউ কেউ তাদের আঁটল, আবার কেউ বর্শা জাল পেতে আসে ধান গাছের মধ্যে। সকাল হতেই যে যার জাল, আঁটল, বর্শা তুলে আনে। দাদুও আঁটল পেতে ছিল। দেখলাম দাদুর আঁটলে বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো কৈ মাছ আর শিঙি মাছ পরেছে, আর কয়েকটা ছোট ছোট কৈ, ট্যাংরাও পরেছে। সেই ছোট ছোট কৈ ও ট্যাংরা মাছ কয়েকটা খাওয়ার জন্য রেখেছে, কয়েকটা মাছ মাছ ব্যাপারী এলে বিক্রির জন্য রেখে দেয়, আর বাকি মাছগুলো নিয়ে দাদু বি.ডি.ও-তে চললেন। ভাবছো কেন? কাকুর OBC সার্টিফিকেট করার জন্য দাদুকে যে কতবার বি.ডি.ও অফিসে ছুটতে হয়েছে তার কোনো হিসাব না করাই ভালো। সেই অফিসের অফিসারকে কত টাকা, বাজারের ভালো কাপড়ের দামি লুঙ্গি, গেঞ্জি, দামি মিষ্টি, ভালো মাছ কিনে তার বাড়িতে দিয়ে আসতে হত। শুধু তাই নয় অফিসের অন্যান্য কর্মে রত কর্মীরা ও অফিসারের সাথে সাথে সেই অসহায় বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে সুবিধা নিত, সেই কর্মচারীদের মধ্যে একজন ছিল বাচ্চু। তারা রোজ দাদুর কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করত আর সেই বৃদ্ধ মানুষটাকে আশা দিত যে সামনের সপ্তাহে আপনার কাজটা হয়ে যাবে বানুদা আপনি এখন বাড়ি ফিরে যান। দাদুও সেই আশায় বাড়ি ফিরে আসতো। বাড়ি ফেরার সময় দেখা হল নেপু দাসের সাথে যে কিনা সম্পর্কে দাদুর ভাগ্নে হয়। নেপু দাস বলে 'কি মামু কাজ হল?' দাদু বলল পরের সপ্তাহে হয়ে যাবে বলেছে আর ছুটতে হবে না। তখন নেপু দাস বললেন ' মামা কয়েক জোড়া চটি জুতো কিনে রাখো কাজে দেবে।' আমি তখন সেখানে ওই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু ওই কথার মানে বোধগম্য হওয়ার মতো বয়স

আমার হয়নি, কিন্তু দাদু বুঝেছিল হয়তো। নিজের বাড়ির বাগানের কচি লাউ, নটে শাক, সব্জি, নারকেল এই সমস্ত সামগ্রী বিভিন্ন সময় অফিসারের বাড়িতে দিয়ে আসত। এক সপ্তাহে আবার বাজারের টাটকা ফল আর এক জোড়া জুতো কিনে নিয়ে গেল দাদু সেই অফিসারের জন্য এই আশা নিয়ে যে এবার শেষ অব্দি সার্টিফিকেট হয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে দেখল সেদিনও হয় নি। অফিসার বলল যে ভানুদা হয়ে এসেছে আর একটু বাকি আছে আপনি কিছু মনে করবেন না, সামনের সপ্তাহে অবশ্যই হয়ে যাবে। দাদুও প্রতিবারের মতো এই আশায় বুক বেঁধে বাড়ি ফেরেন যে এবার অবশ্যই কাজটা হয়ে যাবে। এই ভাবে পাঁচটা বছর অতিক্রম হয়ে যায়, অবশেষে একদিন যখন পুনরায় বি.ডিও অফিসে যাবে বলে দাদু বেরিয়েছেন তখনই দিদা বলেন কিগো নাতনিটার তো দু তিন দিন ধরে জ্বর, কিছুতেই কমছে না, আজ ওর জন্য মনে করে ওষুধ আর একটু ফল এনো। হাঁটতে শুরু করলে কিছুটা যাওয়ার পর দাদু দেখেন পায়ে একটা বাবলা কাঁটা ফুটে গেছে। দাদু ভাবলো যে জুতো থাকতে কী ভাবে পায়ে কাঁটা ফুটতে পারে, আর জুতোটা খুলে যেই না হাতে নিলেন দেখলেন যে জুতোটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে তার আর পায়ে দেওয়ার মতন অবস্থায় নেই। তাই খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দু-ঘন্টার রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন। অফিসার এমন কি অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা সেদিন নতুন এক উচ্চপদসস্থ অফিসার আসবেন বলে অফিস সাজানো থেকে শুরু করে নতুন অফিসারকে অভ্যর্থনা জানানোর পরিকল্পনায় ব্যস্ত সবাই। শেষ পর্যন্ত অফিসার এলেন, দাদু সেখানে বাইরে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন খালি পায়ে আর কিছু বলারও চেষ্টা করেন কিন্তু বলার কোনো সুযোগ পেলেন না। নতুন অফিসার ওই বৃদ্ধ মানুষটিকে জানতে চাইলে বাচ্চু বলে কর্মচারীটি বলেন যে - বৃদ্ধ এখানে এসেছেন কিছু সাহায্য চাইতে, স্যার আপনি ওসব ছাড়ুন তো এরকম ভিড় রোজই হয়। তা শুনে নতুন অফিসার তার এই শুভ দিনে কোনো রকম বিড়ম্বনা চায় না বলে বাচ্চুর হাতে ৫ টাকা দিয়ে বলেন যে বৃদ্ধকে দিয়ে যেন বিদেয় করে। সেই টাকাটা বৃদ্ধকে না দিয়ে কর্মচারীটি তাকে তাড়াতে গেলে দেখেন বৃদ্ধ চলে গেছেন আর সেখানে পড়ে রয়েছে বৃদ্ধের সেই হত দীর্ণ চটি জোড়া, যা তিনি ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই দু-ঘন্টার রাস্তা খালি পায়ে ধীর মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ভাবতে থাকেন তার নিজের শরীর অসুস্থ, এমনকি বড় নাতনিটির তিন দিন ধরে জ্বর, ডাক্তার দেখানোর মতো পয়সাও তার কাছে নেই। অথচ অফিসের সেই অফিসার সহ কর্মচারীদের যতটা সম্ভব নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে তিনি তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করেছেন। আর এতো দিন ধরে যারা তার টাকায় ভালো মন্দ খেয়ে পরে এসেছেন, আজ তারাই বলে কিনা তিনি নাকি তাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন। এরপর হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে তিনি যখন বাড়ির কাছাকাছি শুকনো বটতলার কাছে এসে পৌঁছান, তখন তার সাথে দেখা হয় নেপু দাসের, সে খবর কি জানতে চাইলে দাদু শুকনো বটগাছের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর বলেন - ''দেশের আইন তৈরী করেন তারাই, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে, তারাই সমাজের মেরুদন্ড। আর আমরা হলাম সমাজে কীটেরও অধম। আমরা সমাজের ব্যয়বহনকারী মাত্র।''

এই কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ সেখানে সেই জীর্ণ পাতাঝরা শুকনো বটগাছটার তলায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

অকর্মা

রামপ্রসাদ বেরা
প্রাক্তন ছাত্র, এম.এ, বাংলা বিভাগ

এখন আড্ডা আর তেমন দিতে পারি না আমরা। কেউ কাজে কেউ অকাজে ব্যস্ত, তবু আমাদের নিজের বলে যেটুকু সময় পাই নিজেদের মতো আড্ডা মেরে কাটাই। আমাদের গ্রামের পুজো প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে হয়। আমরা বন্ধুরা যে যেখানে থাকি না কেন, আমাদের এই সময়টাতে বাড়ি ফিরতে হয়। পুজোর কটা দিন কাটিয়ে আবার ফিরতে হয় নিজেদের কাজে। আমাদের আড্ডা হয় মাঠে না হলে আমাদের ঠাকুরানী নদীর এক নম্বর সাহেবের ঘাটের ভাঙ্গা জেটিতে। জেটি থেকে এখন আর কোনো নৌকা চলে না। তবে কয়েকটি জেলে নৌকা এখনো থাকে। যে দিকটা চাষের জমি আছে সেই দিকটাতে অল্প কিছু জায়গা জুড়ে বাঁধের পাশ ধরে জঙ্গল রয়েছে। চাষের জমির পাশে রয়েছে মাছ চাষের বিরাট খাল, তারপরে সোজা জঙ্গল চলে গেছে, তার পাশেই রয়েছে শ্মশান, তার কিছু দূরেই জেটিঘাট।

এখানে আমাদের আবাল্য আড্ডা, বাইরের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ বলতে গেলে। আড্ডার বিষয়বৈচিত্র্য আছে। রাজ্য রাজনীতি সিনেমা ইত্যাদি এরমধ্যে কোনোটাতেই গভীরতা ছিল না। আমাদের ছোটবেলায় এখানে আড্ডা মারার প্রধান কারণই ছিল রায়দিঘি থেকে নৌকায় করে খবরের কাগজ আসা, সেই কাগজের জন্য আমাদের সারাদিন অপেক্ষা করতে হত। চারটের নৌকায় তা এসে পৌঁছাতো। আজকাল অবশ্য তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না সবার হাতেই মোবাইল।

আজ প্রচন্ড মেঘ করেছে, বৃষ্টি হবে না এটা ঠিক। কারণ কয়েকদিন ধরেই কেবল মেঘ করছে কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। জেটিতে একটি গুমটি ছিল সেখানে বসেছিলাম আমরা। আমাদের পাশে কিছুটা দূরে কয়েকটি জেলে মন দিয়ে তাদের ছেঁড়া জাল সেলাইয়ের কাজ করছে আর কয়েকজন গাঁজাখোর অযথা গুলতানি মেরে কাটাচ্ছে।

নদীর ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ করে পাড়ে এসে পড়ছে। এতদিন পরে যখন সবাই একত্র হয় তখনো যেন নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কথা ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে। কোথায় কোথায় কত কথাই না উঠলো। কৃপা কবিদের মতো বিজ্ঞের দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে আমাদের এই ঘাটের বুড়ো মাঝির কথা বলল। সত্যি তো আমরা প্রায় ভুলে গেছিলাম তার কথা। বুড়ো বেঁচে আছে কিনা আমরা সত্যিই এখনো জানিনা। তার নাম পর্যন্ত আমরা কেউ শুনিনি কখনো। কেবল নটার খেয়ার মাঝি বলে তার পরিচিতি ছিল। মাঝি লম্বা, রোগা, কুঁজো ছিল। বয়স হয়েছিল ঢের কিন্তু বুড়োর দম ছিল। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক নটার খেয়া তার দেওয়া চাই। জেটিতে আসার পরই সে চিৎকার করত, -'কেউ যাবে গো নটার খেয়া ছাড়বে, কেউ যাবে গো?' গলার স্বর ছিল কাঁসার মতো। দূরবর্তী কোনো যাত্রী থাকলে তিনি সাড়া দিতেন।

সকলের মাঝে হঠাৎ বিপিন বলে উঠল কোটো সুন্দরীর কথা। কোটো সুন্দরী একজন ভিখারি। তার নির্দিষ্ট

কোন ঘর ছিল না, কখনো বাজারে, কখনো মোড়ে, কখনো শ্মশানে থাকতো। হিন্দি বাংলা পাঁচমিশালী ভাষায় কথা বলত। তার কিছু কথা বোঝা যেত, কিছু কথা বোঝা যেত না। লোকের বাড়ি বাড়ি খাবার চেয়ে ভিক্ষা করে তার দিন কাটত। আমাদের কাছে এটা আশ্চর্য লাগতো সে প্রচুর গাঁজা খেত, গাঁজাখোরদের সঙ্গে। বলতো - ‘দিদিয়ে মহাদেব কো’। অনেকে বলতো কোথাও হয়তো খুন জখম করে পালিয়ে এসেছে। আবার কেউ কেউ বলতো ও একসময় ভৈরবী ছিল। অনেককেই এটাও বলতে শোনা যায় কিছু দূরে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্বামীর প্রচুর মার খেয়ে আর সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে আসে স্বামীকে ছেড়ে।

এইসব নানা রকম সাতপাঁচ কথা আলোচনা হচ্ছিল। যার ঠিক কোন মাথামুন্ডু নেই, গতি কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছিল তার কোন ইয়াত্তা ছিল না কারো।

ভুট্টা অর্থাৎ ভুবন বাবু আমাদের থেকে বেশ বয়সে বড়। তিনি এতক্ষণ ধরে এসব শুনছিলেন। কিন্তু একটি কথা বলেননি এবারে তিনি একটা জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এসব পুরানো কথাবার্তা শুনলে অনেক কথাই মনে পড়ে। অনেক সময় আবেগঘন হয়ে পড়ে মানুষ। ভুবনদা বললেন জীবনে এমন কাজ কখনো তোমরা কেউ করেছ যা অন্যায় নয় অথচ মনে মনে অন্যায় বোধ হয়ে এসেছে। এটা গত বছরের কথা। বলেই ভুবনদা একটা গল্প শুরু করলেন -

আমার মত অকর্মা লোকেরা যখন কিছু করতে পারে তখন তাদের যে কি অবস্থা হয় তা বলা কঠিন। তোমরা তো সকলেই জানো কয়েকটি টিউশন করে যা পাই তাতে নিজেরই কোনরকম চলে। সংসারের তেমন কিছুই দিতে পারি না। গত বছর এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বাড়ি ভাড়া ছেড়ে দিয়ে আমাকে সেই এখানে এসে আশ্রয় নিতে হলো। অথচ বাড়ির অবস্থা তো জানোই। বাড়িতে একমাস কাটানোর পর আর ভালো লাগছিল না। অভাব-অনটন কাকে বলে এর আগে সত্যিই তেমন করে প্রত্যক্ষ করিনি। কীভাবে সংসার চলে তাও কোনদিন ভালোভাবে টের পাইনি। বাড়িতে কথা দু-একটা শুনতে হতো এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই একটি ইলেকট্রিক গ্রুপের সঙ্গে হেল্পার হিসেবে কাজে যাই। সেও বলে কয়ে নিতে কি আর চায়! সূর্যপুর এর সীমান্ত পাড়ায় আর আমাদের একটি স্কুলে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ভারী কাজ কষ্ট হয়, তাও উপায় নেই করতে তো হবেই। তাও কি আর শান্তি আছে! স্কুলের কলটাতেই আমাদের চান করতে হতো। তাও গ্রামের লোকদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন ঝগড়া। তারা চান করতে দেবেন না। অথচ তাদের গ্রামের কাজ। কেউ অন্য কোন পুকুর দিতে নারাজ চান করার জন্য। আগে নাকি কোনো এক ইলেকট্রিকের গ্রুপ ঝামেলা করে পালিয়ে গেছে তাই তারা আমদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

আমরা কয়েকজন ছিলাম যারা দুপুরে চান করতাম না। কাজ সেরে একেবারে সন্ধ্যেবেলায় চান হত। প্রতিদিনের মতো সেদিনও চান করছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো, জল আনতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জা এবং সংকোচে যেটুকুনি জল বালতিতে ছিল সেটা মাথায় ঢেলে চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময়

বৃদ্ধাটি বললেন - ও ভাই আরো বালতি দুই ঢাল, আমার তাড়া নেই। আমার মনের ভাব বুঝে আবার বললেন, লজ্জা কি নাতি তো হও। কিন্তু আমি আর চান করতে পারলাম না।
বুড়ির সাথে সেই প্রথম আলাপ। দেখতাম প্রায়ই আমার চানের সময় আসত আর ফিরত একদম সন্ধ্যা হলেই। কলসি নিয়ে নড়বার শক্তি আর নেই, তাই সবার শেষে জল নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি যেতেন বৃদ্ধা। আমি প্রায়ই তার কলসি ভরে দিতাম। একদিন বললাম তোমার ছেলে বউকে তো পাঠাতে পারতে রোজ রোজ এভাবে কষ্ট করে নিয়ে যাও কোন দিন পড়ে তো মারা পড়বে। বুড়ি একটুখানি হেসে আর ফোকলা দাঁতে বললেন, সবাই দিল্লি চলে গেছে, নাতনির জন্য বড্ড মন কেমন করে বাবা। কী সব চলছে দেশে বাঁচে কি মরে তাও খবর পাই না। নম্বর একটা দিয়েছিল আমাকে কেউ ফোন করে দেয় না, টাকা চায় সবাই, টাকা কোথায় আমার কাছে। ভুবনদা একটু থামলেন, উনি বললেন জানো বৃতি, মানুষ এরকম। কেউ দায়ে পড়ে, কেউ দায়ী, কেউ দায় এড়ায়। অথচ খুব একটা ব্যাপার নয়।
আমরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে, ডুবে যাওয়ার সূর্যের রোদ তার মুখে, ভুবনদা বলতে শুরু করলেন - আমাদের এক টাইম কাজ হতো। সকাল ছয়টা থেকে একেবারে তিনটে চারটে পর্যন্ত ঠিক থাকতো না। মাঝে একবার পান্তাভাত দিত দশটায়। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও কিছুদিনের মধ্যে এগার হাজার চারশো চল্লিশের একজন ছোটখাটো মিস্ত্রি হয়ে উঠলাম।
বিকেলে চান সেরে খাওয়ার পর ঘুম আসত। কিন্তু সেই বুড়িটার সঙ্গে কথা বলার জন্য কেমন যেন হত। বুড়ি ও প্রতিদিন জল নিতে এসে আমার দেখা না পেলে অন্যদের কাছে জানতে চাইতো।
সেই বুড়ির সঙ্গেই মাঝে মাঝে বেশ আড্ডা জমে উঠত। একদিন তার ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছিলাম আমার ফোনে। বুড়ি তার নিদারুণ দুঃখের কাহিনী আমাকে শোনাতো। আমিও আমার কথা বলতাম। কাজের শেষে সবাই সবার মতো থাকতো কথা বলার লোক যেমন নেই, এ কাজের লোক নই বলে তেমন ভাল লাগতো না। তাই বুড়ির সঙ্গে কথা বলতে ভালই লাগত। বুড়ি প্রায় কাঁদে, তার ছেলে বউ কবে আসবে, নাতনি কবে আসবে! বলতো তার নাতনি থাকলে তার এমন কষ্ট হতো না।
বুড়ো মানুষ তাতে আবার একা, আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা কিছু দূরে তাও দেখে না তারা।
বেশ কয়েকদিন বুড়ির দেখা পেলাম না। আমাদের কাজের চাপ ও বাড়ছিল। একদিন বুড়ির পাশের পাড়াতে কাজ হল। বুড়ির দেখা পেলাম। কাজের শেষে বুড়ির বাড়ি ঘুরে এলাম। কি বলবো তোমাদের সে কথা, সত্যি দেখলে মনে হয় ঐতিহাসিক যুগের বসতবাটি যেন। লতা জঙ্গল চারিদিকে। ধারে অনেকগুলো গাছ ভেঙে ঘরের চালে পড়ে আছে। কাটবার কেউ নেই, কেমন যেন মনে হলো, বললাম এগুলো কাটাওনি কেন? কাউকে দিয়েস কোনদিন তো ঘরটা ভেঙে তোমার গায়ে পড়বে। বুড়ির সেই শান্ত হাসি হেসে বলে লোক কই বাবা বাড়িতে কি কেউ আছে? টাকা কোথায়? বলে ২০০ টাকা লাগবে। গাছগুলো বেশ বড়, ডালপালা প্রচুর। বুড়ির কাছ থেকে কাটারি চেয়ে যাতে বাড়িটার ক্ষতি না হয় সেরকম করে দিলাম। অনেক বারণ করল বুড়িমা, থাক বাবা থাক, ও আমার কিচ্ছু হবে না। আমার ছেলে এসে সব পরিষ্কার করে দেবে, নিজে তো কিছু পারিনে। যখন চলে আসছি তখন বুড়ি মা বললেন

তোমাকে যে একটু গুড়-মুড়ি নাড়ু দেবো তা বাবা কিছুই নেই। গাছের কয়েকটা নারকেল পড়েছিল, তার থেকেই কটা দিলুম নিয়ে যাও। নিলাম, না বললাম না।

পরের দিন আবার দেখা হল বুড়িমার সাথে। বুড়িমা কাঁদছেল। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? বুড়িমার কোন আত্মীয় নাকি কলকাতায় ছিল তারা করোনা ভাইরাসের ভয়ে কলকাতা থেকে গ্রামে পালিয়ে এসেছিল। আসার পর তারা থানায় যোগাযোগ করে নি। তাই পুলিশ করোনা ভাইরাস রিপোর্ট জানার জন্য তাদেরকে নিয়ে গেছে। এদিকে বাড়ির আর দশটা গরু, সাতটি ছাগল জল খাবার না পেয়ে গোয়ালে মরেছে। যে কজন বাড়িতে ছিল তাদেরকেও নিয়ে গেছে পুলিশ। আর বাড়ির যা কিছু জিনিসপত্র ছিল তার বেশিরভাগই জিনিস সব চুরি হয়ে গেছে। বুড়িমার কান্না থামিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যা গেছে তাকি আর পাবে, কেঁদো না। বুড়িমার গরু-ছাগলগুলোর প্রতি মায়া দেখলাম তিনি বললেন আশেপাশের মানুষগুলো এমন বাবা জন্তুগুলোকে একটু জলও দেয়নি। ভয় তাদেরও নাকি কি সব ভাইরাস ধরবে। কি সব চারিদিকে হচ্ছে, সবাই চলে আসছে আমার ছেলে যে কবে আসবে জানি না, একা থাকি। বুড়িমা বললেন একবার কথা বলিয়ে দিও তো বাবা, কেঁদে -কেঁটে বলি যদি আসে ছেলে। আমি বললাম আমার কাছে তো এখন ফোনটা নেই আমি বরং কাল তোমাকে কথা বলিয়ে দেবো। এবারে বরং ছেলের ভিডিও কলে কথা বল। মানে তুমি তোমার ছেলেকে দেখতে পাবেফোনে।

কয়েকদিন আমাদের কাজের প্রচন্ড চাপ বেড়ে গেল সকাল ছটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। বুড়ি মাকে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারিনি। একদিন আমাদের ঠিকাদার এসে জানালেন কাজ বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে হবে। এলাকায় নাকি আরো আট দশজন লোকের করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে। আমাদের বাড়ি ফেরার পালা।

তারপর দুদিনের মধ্যে কোনরকমে কাজ শেষ করা হলো, ঝড়ে যে হারে পোস্টগুলি পড়ে গিয়েছিল তাতে ভালো করে সারাই করলে আরো মাসখানেক কি মাস দেড়েক চলতো। কোনরকমে শুধু পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগটুকু যাতে যায় সেইটুকু করে দেওয়া হলো। ফেরার দিন সকালে গাড়ি। হঠাৎ মনে পড়ল বুড়ি মার সঙ্গে একবার দেখা করা হলো না। এদিকে সকলেই আতঙ্কে আছে এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজি নয়। এদিকে পুলিশ প্রশাসনও আমাদেরকে ফিরে যেতে বারবার বলেছেন। গ্রামবাসীরাও তাড়া দিচ্ছেন যতই হোক আমরা বাইরের লোক। তাও বড্ড মনটা কেমন করে উঠলো। ঠিকাদারকে বলে, বুড়ি মার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমার জন্য সেদিন অনেকটা দেরি হয়েছিল গাড়ি ছাড়তে। বুড়িমা আগেরদিন রাতে মারা গিয়েছিলেন। খুব কষ্ট বোধ হয়েছিল। মানুষটার বয়স হয়েছিল অনেক। আমার ঠাকুরমার বয়সী বোধহয়। আপন না হয়েও যে আপন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি এই অপরিচিত জায়গায়। খুব আফসোস হয়েছিল বুড়িমা কতবার করে ছেলে বউ নাতনিকে দেখতে চেয়েছিলেন, কথা দিয়েও একবারও তাদেরকে ভিডিও কলে কথা বলে দিতে পারিনি।

বুঝলে হে, জীবনে মানুষ অনেক কিছুর সাক্ষী থাকে, কথনো তার নিজের জন্য, কখনো অন্যের জন্য। ভুলে যাওয়া যেটা সহজ ছিল সেটাই ভোলা যায় না সহজে।

প্রতিবাদের ভাষা

শুচিস্মিতা ভদ্র
অধ্যাপক, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

''এখন ঘোর ভাঙেনি তোর যে, মেলেনি তোর আঁখি'' - অনেকদিন পর গানটা এফ এমে শুনে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল লালিমা। বাবার বড় প্রিয় গান ছিল। সকালে ছোট্ট লালিমাকে ঘুম থেকে জাগানোর পর আধো ঘুমন্ত, আধো জাগন্ত লালিমাকে প্রায়ই কোলে নিয়ে মজা করে ভরাট ও দরাজ গলায় গানটা গেয়ে উঠতেন শীর্ষেন্দু।

বাবা আজ নেই, প্রায় বছর ঘুরতে চলল। সময় নদী যে কখন বয়ে গেল ? লালিমা টেরই পেল না। এতগুলো দিন কেটে গেল বাবাকে ছাড়াই, ভাবে লালিমা। বাবার আদরের লালি অবাক হয়ে যায়। অথচ এটাই সত্য। দিন চলে যায়, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জন স্মৃতির মাঝে থেকে যায়। তাঁকে ছোঁয়া যায় না, আর কাছে পাওয়াও যায় না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে যেন সন্তানের মধ্যেই নিজের ছাপ রেখে যায়। মা, লালিমাকে চিরকাল বাপসোহাগী বলতেন। তিনি এখনও লালির কথায়, কাজে নিজের বড় প্রিয় মানুষটার প্রতিরূপ দেখতে পান।

গানটা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই কলিংবেলের যান্ত্রিক শব্দে লালিমার ঘোর সত্যিই ভেঙে যায়। দরজা খুলে দেখে রূপকে নিয়ে তার বাবা প্রান্তর ফিরেছে। রূপ এখন সবে পাঁচ বছরে পা দিয়েছে।

রাতে রূপকে ঘুম পাড়িয়ে যখন লালিমা স্মার্ট ফোন হাতে নিল, তখনও প্রান্তর শুতে আসেনি। রাতে একটু খবরের কাগজে চোখ বোলায় সে। এ তার বহু বছরের অভ্যাস। ড্রইংরুমের সোফায় বসে খবরের কাগজের সব খুঁটিয়ে পড়াকে যোগ্য সঙ্গত করে, টেলিভিশনে চলতে থাকা কোন না কোন খেলার চ্যানেল। এ নিয়ে আগে লালিমার সাথে বচসা চলত। লালিমার বক্তব্য ছিল, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এটাই যে প্রান্তরের ক্লান্তি মুক্তির একমাত্র উপায়, তা বোঝার পর লালিমা এ নিয়ে এখন আর কিছু বলে না।

স্মার্ট ফোনের যুগে বিশ্ব আমাদের হাতের মুঠোয়। লালিমা, আজ অনেকক্ষণ ধরে তার বাবার প্রিয় গানগুলো খুঁজে বরে করে অনলাইনে শোনার চেষ্টা করল। বিকেলে গানটা শোনার পর থেকে বাবাকে যেন খুব বেশি করে মনে পড়ছে। গানগুলো শুনতে শুনতে, কখন নিজের অজান্তেই চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজে যাচ্ছিল খেয়ালই করেনি। হঠাৎ কপালে হালকা হাতের আলতো ছোঁয়ায় তাকিয়ে সে প্রান্তরকে দেখতে পায়।

''কী হয়েছে লালি ? বাবার কথা মনে পড়ছে ?'' - প্রান্তরের প্রশ্নে লালিমা তাকে আঁকড়ে ধরে, সম্মতি জানায় মাথা নাড়িয়ে।

রবিবার ছাড়া প্রতি সকালেই লালিমার ব্যস্ততা চুড়ান্ত সীমা অতিক্রান্ত করে। চা, জলখাবার, রূপকে ঘুম থেকে তুলে স্কুলের জন্য তৈরি করা, প্রান্তর আর তার নিজের টিফিন তৈরি করা ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা আর ছেলে ঝড় তুলে বেরিয়ে গেলে আধাঘন্টা একটু কাজের ছুটি মেলে। এই সময় সে একটু খবরের কাগজে চোখ বোলায়। এরপর রান্নার দিদি এসে গেলে তাকে সব বুঝিয়ে, নিজেও বেরনোর প্রস্তুতি নেয়। সে আজ বছর সাতেক একটা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা।

আজ খবরের কাগজের দু দুটো খবরে মনটা সকাল সকাল খারাপ হয়ে গেল। কাগজটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখল লালিমা। কিন্তু খারাপ খবরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, আদৌ কি তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়?

একটা ঘটনা, রাজস্থানের কোন এক বাজারে বোমা বিস্ফোরণে শতাধিক প্রাণহানি, জনা তিরিশ আহত, পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে। বিস্ফোরণের কারন কোন জঙ্গি সংগঠন এখনও স্বীকার করেনি। দ্বিতীয় ঘটনার স্থান, আমাদেরই শহর, কলকাতা। শিশু কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার। একটি সাতবছরের শিশুটি মানসিক ভারসাম্যহীন।

এ কোন যুগে আমরা বসবাস করছি? হিংসা, ধর্ষণ, খুন ... অপরাধ প্রবণতা দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে। সকলেরই মনে নানা অসন্তোষ, তার পরিণতিই কি অবক্ষয়মুখী করে তুলেছে সকলকে? লালিমার মতো করে এমন কথা প্রতি নিয়ত আমাদের মনে তোলপাড় হয়, কিন্তু এর উত্তর নেই কারোর কাছে।

''লালিমাদি, আজকের কাগজ পড়েছো?'' রীমিকার প্রশ্নে, খাতা দেখা না থামিয়ে, লালিমা বলে - ''হ্যাঁ রে, দুটো খবরই দেখলাম সকালে, কাল হয়তো টেলিভিশনে দেখিয়েছে, আমার দেখা হয়নি সময়াভাবে।''

রীমিকা বলে - ''এতো মানুষ মেরে কার কি লাভ হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে বলো দেখি? আর অন্য খবরটার কথা ভাবো, এরা সব মানুষ?''

লালিমা মাথা নাড়ে, বলে - ''কি সব যে হচ্ছে চারদিকে, ভালো লাগে না। তোর মেয়ে এবার ফোরে উঠল না রে?' রীমিকার সম্মতিতে লালিমা বলে - ''সাবধানে রাখিস''

'সে তো নজরে রাখিই, কিন্তু সর্ষের মধ্যেই তো ভূত লালিমাদি, তুমি নিশ্চিন্ত, তোমার তো ছেলে।''

''ছোট ছেলেরাও পুরোপুরি সুরক্ষিত নয় রে, তবে বলতে পারিস বড়ো হয়ে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত, আমাদের তো আজীবন সতর্কতার বর্ম পরে ঘুরতে হবে। এই আমরা কি ঘরে, বাইরে নানাবিধ অপ্রীতিকর ঘটনার থেকে রেহাই পেয়েছি বল? আমাদের অনেকেরই তো বয়স নেহাত কম নয়।''

হঠাৎ ওদের আলোচনায় এসে যোগ দেন, অঙ্কের বয়োজ্যেষ্ঠ, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নিবারণদা, বলেন -- ''তোমাদের চিনি, জানি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাও দোষী, সে যাই বলো। আজকাল মেয়েদের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ যা হয়েছে।''

নিবারণদার কথা শেষ হতে না হতেই ভূগোলের শিক্ষিকা ঋতুপর্ণা চি ৎকার করে ওঠে - ‘‘নিবারণদা, কে কিভাবে নিজেকে ক্যারি করবে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার মানেই কি সে সহজলভ্য? আর তাই তার সাথে যা ইচ্ছা করার অধিকার জন্মে যায়? আর কালকের ঘটনাতে কাকে দায়ী করবেন? অসহায় একটা শিশু তাও আবার মানসিক ভারসাম্যহীন।

হঠাৎ দেখা যায়, সাম্প্রতিক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ও সেই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে যে সব হিংসাত্মক কার্যাবলি ঘটছে, এছাড়াও সারা দেশের বর্তমান নানান হিংসাত্মক ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ দুটো দল তৈরি হয়, একটা জোরালো বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। আসলে সবে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই এখন ছাত্রছাত্রীদের ছুটি। টিচারদের ছুটি নেই, ক্লাস না থাকলেও এ সময়ে খাতা দেখা, নির্ধারিত দিনের মধ্যে রিপোর্ট কার্ড তৈরি এসব নিয়েই এখন হাল্কা ব্যস্ততার বাতাবরণ।

হঠাৎ প্রধান শিক্ষিকা অনুভাদি, দরজা ঠেলে টিচার্স রুমে প্রবেশ করেন। ওনার কাছে এই তর্কবিতর্কের খবর পৌঁছে গেছে অফিসের পিয়ন নন্দের মাধ্যমে। নন্দ সব দিকেই আছে। এদিকের খবর ওদিক, ওদিকের খবর এদিক করার জন্য বেশ প্রসিদ্ধ। শিক্ষক, শিক্ষিকারার যে কোন বিষয় আলোচনার আগে খুব সাবধানে কথা বলে, কিন্তু আজকের আলোচনায়, বিবদমান দুই গোষ্ঠীর কেউই খেয়াল করেনি। যথারীতি এই আলোচনার খবর পাওয়ার কিছু পরেই স্বয়ং অনুভাদি মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন।

‘‘আপনারা কী শুরু করেছেন বলুন তো? খারাপ ঘটনাগুলো নিয়ে এখানে ঝড় না তুলে, কিছু তো করার কথা ভাবতে পারেন। আমাদের সবার যৌথ ভাবনায় ভালো কিছু হতেও তো পারে। আমরা তো সকলেই ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ার কারিগর। সেই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েই তো এই কর্ম বেছে নিয়েছি। হ্যাঁ অবশ্যই এ আমাদের রুজি রুটির মাধ্যম। কিন্তু আমরা এসবের প্রতিবাদ তো করতেই পারি, এমন মেজাজ না হারিয়ে ... আর প্রতিবাদের ভাষার হিংসাত্মক হওয়ার কোন দরকার আছে কি? আপনারা কী বলেন?’’

লালিমা আর ঋতুপর্ণা সমস্বরে বলে ওঠে ‘‘কী ভাবে প্রতিবাদ করব দিদি? ফেসবুকের প্রোফাইল ছবি সরিয়ে, নাকি মোমবাতি মিছিল করে? লাভ হবে এভাবে?’’ অনুভাদি স্মিত হাসি ছড়িয়ে বললেন -‘‘তন্ময়, তুমি তো ইতিহাসের ছাত্র। তুমিই এর উত্তর দাও। ঘৃণ্য কাজের প্রতি সরব হওয়ার মাধ্যমটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সরব হওয়াটা। প্রতিবাদের ভাষা যুগে যুগে একই। প্রকাশ ভঙ্গি পৃথক। না হলে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদ্রোহী কবি নজরুলের কারাবাস হতো না। সক্রিয় সংগ্রামে অংশ না নিয়েও অনেক কবি, লেখক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এর নজির তো ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে।’’

তন্ময়, সম্মতি জানায় অনুভাদির কথায় - ‘‘ঠিক বলেছেন দিদি, সারা বিশ্বের বিপ্লবের ইতিহাস তো তাই

বলে।” অনুভাদি বলেন - ‘‘একদমই তাই। আর লালিমা আর ঋতুপর্ণা আপনাদের দুজনকেই বলছি সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি সরানোও একটা প্রতিবাদ। আমরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সামনের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তো বর্তমানের এই সব হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাটক বা নৃত্য/গীতি আলেখ্য করতে পারি। এবছর এখনও পর্যন্ত এসব নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। প্রতিবারের মত এবারেও রেজাল্ট বেরনো র পরই হবে আলোচনা। এ বছর এধরনের কিছু করা যায় কিনা দেখুন না। কি বিপাশা তুমি কি বলো ? আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পারবে না ?

বিপাশা স্কুলের সাংস্কৃতিক বিভাগের সদস্য, সে এগিয়ে আসে , ‘‘দিদি ঠিক বলেছেন, এটাই হোক এ বছর আমাদের স্কুলের তরফে ছোট্ট শুরু। এই মঞ্চই হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিবাদের মঞ্চ।” খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ে বিপাশা। যার প্রকাশ ঘটে তার কথায়। অনুভাদি বিপাশাকে আরো উৎসাহিত করেন -‘‘ এই তো চাই বিপাশা। আমরা সবাই মিলে প্রতিবারের মত এবারও খুব সুন্দর একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করব। আপনাদের আলোচনা আমাকে বিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করলো, কি বলেন ?”

লালিমা, বাড়ি ফিরে, রাতে খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার পর প্রান্তরকে স্কুলের আলোচনার আদ্যোপান্ত শোনায়। প্রান্তর খুবই উৎসাহ দেয়। লালিমার গতকালের ভারাক্রান্ত মনটা যেন একটু উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, বলে - ‘‘জানো প্রান্তর, বাবাদের অফিসের ১২/১৩ জনের একটা ছোট দল ছিল। বাবা বলতেন ‘অনু দল”। বাবাই নাম দিয়েছিলেন - ‘‘ভাষা’। একটা সময় ‘ভাষা’ নানাধরণের পারিবারিক, সামাজিক, বিশ্বজনীন সমস্যা নিয়ে পথনাটিকা করত।”

এবার প্রান্তরের অবাক হবার পালা, -‘‘তাই নাকি ? দারুন তো। বলনি তো কখনো।” লালিমার দৃষ্টি অতীতের মাঝে হারিয়ে যায়, বলে - ‘‘আসলে সে সব আমার ছোট বেলার কথা, ওই সব নাটকের ছোটখাট মহিলার চরিত্র যখন থাকত তখন ‘‘ভাষা”র কোন না কোন সদস্যের সহধর্মিণী বা বোন বা মেয়ে সমস্যার সমাধান করে দিত। মাও এক দুবার অভিনয় করেছেন।” প্রান্তর কপট রাগ দেখায় - ‘আর কি কি লুকিয়ে রেখেছ বলো তো ঝু লিতে।”

লালিমা একটু হাসে, প্রান্তরের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলে --‘‘কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘‘ভাষা’ বন্ধ হয়ে যায়। আসলে কয়েকজন বদলী হয়ে যান, আর প্রকাশ জেঠুমণি হঠাৎই মারা যান। উনি রাস্তায় নাটক করার অনুমতিপত্র জোগাড় করতেন, ওনার অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে পরিচয় ছিল। নাটকের সংলাপের কিছুটা বাবা, বাকিটা লিখতেন রমেশ কাকু। সে সব বাদ দাও, আসলে পরবর্তীকাল কাজের চাপ বাড়ে, সাংসারিক নানা দায়িত্ব বাড়ে সকলেরেই। প্রাথমিক উত্তেজনা, উৎসাহে ভাটা পড়ে, সব মিলিয়ে ‘ভাষা” থেমে যায়। তবে সে সময় বাবা খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন। পরে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যায়। মায়ের কাছে হয়তো এখনো ‘ভাষা”র পথনাটিকার ছবি, নাটকের পাণ্ডুলিপি কিছু থাকলেও থাকতে পারে। এবার যেদিন যাব, বলব মাকে। থাকলে নিয়ে আসব।”

'আচ্ছা, বাবা ওই সব পথনাটিকাতে গানের ব্যবহার করতেন?'' - প্রান্তরের প্রশ্নে লালিমা বলে - ''হ্যাঁ, বাবার গানের প্রতি আকর্ষণ তো তুমি জানোই, আর কি সুন্দর যে গাইতেন, । নাটকের বিষয় অনুযায়ী গান নির্বাচন করতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গীতিই বাবার পছন্দের শীর্ষে থাকত সবসময়। অন্য গানও যে নেওয়া হোতো না, এমন নয়। আসলে ছোটবেলার কথা অত মনে নেই, তবে আমি বড় হবার পর বাবার কাছে শুনেছি।'' একটু থেমে লালিমা বলে -'' আমার তো বাবার হাত ধরেই গান শেখা। গানকে ভালোবাসা।'' - লালিমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

''লালি, এতো সুন্দর তোমার গানের গলা। বাবা চলে যাওয়ার পর তুমি কেন গান করা বনধ করে দিলে? এটা ঠিক নয় লালি। আমি বলছি, আবার শুরু করো।''

'ঠিকই বলেছ। আজ অনুভাদির কথায় খুব উৎসাহ পেলাম। বাবা চলে যাওযার পর গান করতে বড়ো কষ্ট হয় গো, অনেক কথা মনে পরে যায়।' - লালিমার গলা বুজে আসে।

প্রান্তর, লালিমার হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে অল্প চাপ দেয়, বলে - ''বাবা যেটা তোমায় দুহাত উজাড় করে দিয়ে গেছেন, তা অবহেলা কোরো না। তুমি এগিয়ে যাও লালি। আমরা সকলেই আছি তোমার সাথে। আর মনে রেখো প্রতিবাদ মানেই ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, রক্তপাত নয়। শিল্পী মনের প্রতিবাদের ভাষা ভিন্ন হবে। তাই তো শিল্পী মন সবার থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এভাবেই সব অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে হবে। ফলের আশা করেই প্রতিবাদ করে যেতে হবে। প্রত্যাশিত ফল না পেলেও প্রতিবাদ থামালে চলবে না।''

''আর এভাবেই প্রতিবাদের ভাষা সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে। রূপকেও এই আদর্শে আমরা মানুষ করব। গুরুজনকে সম্মান করার সাথে সাথে মেয়েদের সম্মান করার শিক্ষা দেবো। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব অন্তত ....''লালিমার কথার বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গি প্রান্তরের দৃষ্টি এড়ায় না। সেও লালিমাকে সব রকমের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেয় মনে মনে।

স্মৃতির শহর

শুভম রায়
পি জি (১ম সেমিস্টার)

ভালোবাসা। ভালোবাসা আসলে কী?

আচ্ছা মানুষেরা প্রেমে 'পড়ে' কেন - 'ওঠে' না কেন? ভালোবাসার কোনো যুক্তিগত সংজ্ঞা বা উপসংহারে পৌঁছানো কি সম্ভব?

১

আজ থেকে কিছু বছর আগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে বি.এ স্নাতক স্তরে ভর্তি হলাম। কিছুদিন পার হল কলেজে। কিছু বন্ধু জুটল আমায়। তবে তাদের মাঝে বার নজর এড়িয়ে আমার চোখ যার দিকে যায়, সেই মেয়েটি হল নন্দিনী। সে আমারই বিভাগের ছাত্রী। তাকে দেখা মাত্রই হৃদয় উথালপাথাল শুরু হয়ে ভাবতে থাকি -- ইস্ যদি তার ফোন নম্বরটা পেতাম, যদি ফেসবুক আইডিটা জানতে পারতাম। মেয়েটিকে দেখতে শান্তশিষ্ট হলেও সে মোটেও শান্তশিষ্ট নয়, বরং তার বিপরীতই। একটু বদমেজাজি, আরেকটু গুন্ডা গুন্ডা ভাবও ছিল তার এককথায় । কলেজে একদিন এক ছেলে তাকে দেখে বলে 'কী গো সুন্দরী'। এর বদলে ছেলেটিকে নন্দিনী যেইভাবে নাকানিচোবানি খাইয়েছিল তারপর থেকে কেউই তার সাথে অভদ্রভাবে কথা বলে না। আর এর ঠিক উল্টোদিকে ছিলাম আমি সহজ সরল, শান্তশিষ্ট এক ছেলে। যাকে আমরা চলতি ভাষায় বলি 'ভোলেভালা লেড়কা'। তা সে যাই হোক, একদিন বুক ভরা সাহস সঞ্চয় করে চললাম তার সাথে কথা বলতে। সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি গো কি করছো'? উত্তর এলো, 'ওরে আগে এই তুমি তুমি করে কথা বলা বন্ধ কর, আর তুই করে বল। তা না হলে কলেজের অন্যান্য মেয়েদের বা দিদিদের সাথে গিয়ে কথা বল আমার সাথে কথা বলতে আসবি না।' এই কথা শোনার পরই আমার অবস্থা তো নাজেহাল, চুপচাপ চলে এলাম সেখান থেকে। আসা মাত্রই বন্ধুরা ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করল ' কি রে ফোন নম্বরটা পেলি?' বললাম 'এই মেয়েকে আমি সামলাতে পারব না আর ফোন নাম্বার তো অনেক দূরের কথা'। তারপর থেকে তার দিকে তাকানো বা কথা বলার সাহস কোনটাই পাই না। কেটে গেল আরও কিছুদিন। একদিন নন্দিনী হঠাৎ আমার বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল। ভাবলাম আচ্ছা আমি আবার কী করলাম? মনে হল আজকের এদের হাসির পাত্র আমি। এরই মধ্যে প্রশ্ন এলো 'কি রে রাগ করেছিস আমার ওপর?' এর আগে মনে হয় কেউই তাকে এত মিষ্টি সুরে কথা বলতে শোনেনি। উত্তর দিলাম, 'না না করিনি'। উত্তর শেষ না হতেই আবারো সেই হুংকারের সুরে নন্দিনী বলে উঠলো, ' আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে। এই আমার ফোন নম্বর। আর যদি মনে করিস ক্লাসের শেষে আমায় ছাড়তে

যেতে পারিস।' এই বলে চলে গেল। কিন্তু এদিকে ফোন নম্বর ও তাকে ছাড়তে যাওয়ার কথা শুনে আমার মনে খুশির জোয়ার বয়ে গেল। যাকে আমরা বলি 'মনমে লাড্ডু ফুটা'। ক্লাস শেষে নন্দিনীকে গিয়ে বললাম, 'চলো তাহলে আজ তোমাকে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে দিয়েই আসি।' এই কথা শুনে নন্দিনী মুচকি হেসে বলল, 'তাহলে তুই যখন তুই করে বলবি না তাহলে তুমিই হোক তবে আমি তোকে তুই করেই ডাকবো।'' তারপর বাস স্ট্যান্ড অবধি ছাড়তে গিয়ে আরো কিছু কথা হলো আমাদের মধ্যে।

২

এরপর মাঝে মাঝেই ফোনে কথা, কলেজে এসে গল্প করা, ছুটির দিনে কখনো কখনো ঘুরতে যাওয়া, এইসব চলতে থাকে। ফাঁকা সময় বসে থাকলে শুধু তারই কথা মনে পড়ে, গানের মাঝেও শুনতে পাই তার গলা, যে কোনো সুন্দর জিনিসেই তার মুখটা ভেসে ওঠে আমার সামনে। তাকে বলতে চাইতাম আমি তাকে ভালোবাসি, কিন্তু ঠিক বলে উঠতে পারতাম না। কিন্তু কিছু সময় মনে হতো আজই তাকে সবটা জানাবো, তবে শেষে সবকিছুই ভেস্তে যেত। ভাবতাম নন্দিনীকে ভালোবাসি বললে তার উত্তরে সে না বলে। আর আমাদের বন্ধুত্বটাও যদি এর জন্য নষ্ট হয়ে যায়। এই ভয়েই কোনদিন তাকে বলে উঠতে পারতাম না, আমি তাকে কতটা ভালোবাসি। একদিন বসন্তের বিকালে ঘুরতে গেলাম শহরের খ্যাতনামা রবীন্দ্র সরোবর পার্কে। অনেকক্ষণ ঘোরার পর আমাদের সঙ্গে আসা বন্ধুরা সূর্যাস্তের ঠিক আগে আগেই নানা কারণে ও কাজের দরকারে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে থাকলো। শেষে শুধু আমরা দুজন সেখানে। বলে উঠলাম, 'সবাই তো চলে গেছে তাহলে চলো আমরা বাড়ি যাই।' নন্দিনী বলল, 'এত কিসের তাড়াহুড়ো তোর?বাড়ি গিয়ে কি করবি? আরেকটু থাকি তারপর যাবো।' এরপর গোধূলি বেলায় আকাশের এক প্রান্ত গাঢ় লাল আর সূর্যের আলোয় সরোবরের জল মুক্তোর মতন ঝিকমিক করে উঠলো, এমন সময় নন্দিনীও বলে উঠলো , 'এখন যা বলতে চলেছি জানিনা এরপর আমাদের বন্ধুত্বটা থাকবে কি না, নাকি আমাদের বন্ধুত্বটা অন্য কোন নাম পাবে। তুই প্রথম যেদিন আমার সাথে কথা বলতে এসেছিলিস আর আমার মুখ ঝামটা শুনে মুখটা কাচুমাচু করে চলে গেছিলিস, তোকে আমার তখন থেকেই ভালো লাগে।' এরপর ভরা জনসাধারণের সামনে আমাকে প্রপোজ করে, 'তুই কি আমার প্রেমিক হবি?'এই প্রস্তাবের পরে মনের একদিকে যেমন বসন্তের বাতাস বইছিল, তেমনি সেখানে উপস্থিত সবাই আমাদের দেখছে, আর আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে তা ভেবে শিউরে উঠেছিলাম। এই দুই অনুভবের মাঝখানে বলে উঠলাম, 'তোমাকে যখন প্রথম দিন কলেজে খোলা চুলে বসে থাকতে দেখেছিলাম তখনই তোমাকে ভালো লেগেছিল। যেমন প্রজাপতি ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তোমার দিকে। তোমাকে ভালোবাসি কথাটি বলার কত শত

বার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনদিনও বলে উঠতে পারিনি। আমি সেই প্রথম দিন থেকেই তোমার প্রেমিক হয়ে বসে আছি।' এই মন্তব্যটি শোনার পরেই নন্দিনী সকল অপরিচিত মুখের মাঝে আমাকে চেপে ধরে আলিঙ্গন করে। চারপাশ ভরে যায় করতালির শব্দে। তারপর হাতে হাত ধরে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আমাদের টক-মিষ্টি তুই-তুমির মধ্য দিয়েই পথ চলা শুরু হয়। কিছু সময়ের মধ্যে কলেজে আমাদের প্রেম বিখ্যাত হয়ে যায়। সবাই আমাদের প্রেমকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বলে অভ্যর্থনা দিত। এইভাবে একে অপরের বাড়ি যাওয়া, বর্ষায় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাত ধরে হেঁটে বাড়ি ফেরা, হাসি ঠাট্টা, সুখ দুঃখ -এর একত্রে আমরা দুই পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিলাম একসাথে। আর পেরিয়ে এলাম দুই দুইটি বছর, এই দুই বছরে আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, কথা কাটাকাটি হলেও তা আমাদের সম্পর্ককে দুর্বল করেনি। বরং সময়টাকে আরো শক্ত বাঁধনে বেঁধে ভালোবাসাকে আরো গভীর ও মধুরময় করে তুলেছিল।

৩

বিগত কিছুদিন বাবদ তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা কিছুই হয় না। ফোন ধরে না, মেসেজের রিপ্লাইও দেয় না। একদিন এক বর্ষার দুপুরে নন্দিনী হঠাৎ ফোন করে, একটু ভারী গলায় বলে, 'খুব দরকারী কথা আছে। আজ সন্ধ্যায় ছটার সময় রবীন্দ্র সরোবরে চলে আসিস।' এইটুকু বলেই ফোনটা রেখে দেয়। সন্ধ্যায় সময়মতো পৌঁছাই পরিচিত জায়গায়। কিছু সময় পরে নন্দিনী ও এসে পৌঁছালো। তবে তাকে দেখে খুব উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছিল। কিছু সময় কথা হলেও, অন্যান্য দিনের মতন স্বাভাবিক ছিল না কিছুই। ওর যে মনের ভিতর কোন বিষয় নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল তা বুঝতে পারছিলাম। এরই মাঝে নন্দিনী বলে উঠলো, 'শোন আমার তোকে আর ভাল লাগে না তাই আমি আর এই সম্পর্কে থাকতে পারবো না।' শোনার পরই মনে হল কেউ আমাকে নিস্তব্ধ নির্জন অন্ধকার গভীর কুয়োয় ধাক্কা দিল। এই স্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে বললাম, 'দেখ এমন মশকরা করিস না আমার এসব পছন্দ না।' আবারও উত্তর এলো, 'দেখ মশকরা করছি না আমি সত্যিই সম্পর্কটাকে ভাঙতে চাই।' এই বলে সে চলে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সব স্মৃতিগুলো, তার প্রেমের প্রকাশ, কত সন্ধ্যা এই শহরের অলিতে গলিতে হাতে হাত ধরে হাঁটা সকল মুহূর্তগুলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ফোন করলাম বন্ধুদের মধ্যে মামনিকে। পরে জানালাম বাকি বন্ধুদের। সব কথাগুলোই বললাম, শুনে মামনি বা বন্ধুরা সবাই আমার মতনই বিস্মিত হল, বিশ্বাস করতে পারল না কথাগুলো। কিছু সময় পার হওয়ার পর বন্ধুরা এসে পৌঁছালো পার্কে। দুই বন্ধু গেল নন্দিনীকে বোঝাতে, তার সাথে কথা বলতে। নন্দিনীকে তারা আবার নিয়ে এলো সেখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে তোমার সত্যি কথা বলো না। যাই ঘটে থাকুক, এই বিপদকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব আমরা। জীবনে কত অন্ধকারের সম্মুখীন আমরা হই, তা পার করেই তো আলোর সন্ধান মেলে।' প্রথমে কিছুই বলতে চাইলো না নন্দিনী। ' না না কিছু হয়নি' বলে

এড়িয়ে যেতে চাইল প্রশ্নগুলি। এবার তার কাঁধে আলতো করে ধরে আবারও জানতে চাইলাম, 'একবার বলো না কি হয়েছে। কি কারণে তুমি আমাকে এই শাস্তি দিচ্ছ?' এই প্রথম আমরা সবাই নন্দিনীর চোখে জল দেখলাম, এর আগে আরো কত নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সে কিন্তু তার চোখে কোনদিনও জল আসেনি। তবে এই প্রথম সে পারলো না চোখের জলকে ধরে রাখতে, ছল ছল করে উঠলো চোখের কোণ দুটি। নন্দিনী বলে উঠল, 'গত সপ্তাহে বাবার হঠাৎ হার্টে অ্যাটাক এসেছিল তাই ওনাকে নিয়ে হসপিটালে দৌড়াদৌড়িতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তোর ফোন ধরতে বা মেসেজের রিপ্লাই দিতে পারিনি। বন্ধুদেরকে জানাইনি, কারণ ওদের জানালে তুইও ওদের কাছ থেকে খবর পাবি তা আমি জানতাম। তাই ওদেরকেও জানাইনি ব্যাপারটা। আমি চাইনি তুই পরীক্ষার প্রস্তুতি ছেড়ে আমার অথবা আমার পরিবারের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে পরিস। এতে তোর বা তোদের খারাপ লেগে থাকলে আমায় ক্ষমা করিস। গতকালই বাবাকে সকালে বাড়িতে এনেছি। বাড়িতে আসার পর সন্ধ্যায় বাবা জানিয়েছেন, কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেলে উনি আমার বিয়েটা দিয়ে দিতে চান। বাবার হার্টের অবস্থা ভালো নেই যে কোনো সময় আবারও কিছু হয়ে যেতে পারে, তাই উনি যত শীঘ্র সম্ভব আমার বিয়েটা দিয়ে দিতে চান। আমার সঙ্গে বাবা ওনার বন্ধুর ছেলের বিয়ে দিতে চান, আর তাকে পাত্র হিসেবে নির্বাচিত করেছেন বাবা। উনি এই বিষয়টি এখন আমাকে জানাতে চাননি, আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার পরেই জানাবার কথা ভেবেছিলেন। তবে ওনার অসুস্থতার কারণে এখন আমাকে জানিয়ে রাখলেন।' কথাগুলো অশ্রুভরা চোখে বলতে থাকলো সে। এই কথা শোনা মাত্রই বলে উঠলাম, 'চলো আজ ওনাকে আমাদের সম্পর্কের কথা জানাই। উনি নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারবেন, আর আমাদের সম্পর্কটাকে মেনে নেবেন।' এতক্ষণে নন্দিনী তার প্রধান ভয়ের কথার আত্মপ্রকাশ করলো, 'না না ওনাকে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না। যদি উনি এই সম্পর্কটাকে মেনে না নেন। যদি আমাদের সম্পর্কের কথা জানার পর আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার হার্ট অ্যাটাক আসে ওনার, কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি নিজেকে ক্ষমা করব কিভাবে!' বন্ধুরা বলে উঠলো, 'তাহলে তোরা পালিয়ে যা, আমরা সব ম্যানেজ করে দেব।' এক্ষেত্রেও সমস্যাটা একই, নন্দিনীর বাবার যদি কিছু হয়ে যায়! তখন আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারবো না। মনের এক কোণে বুঝতে পারছি ওর অবস্থাটা। আমি যেমন বন্ধুত্ব হারানোর ভয়ে তাকে বলে উঠতে পারতাম না তাকে ভালোবাসি, তেমনি সে বাবার প্রাণ হারানোর ভয় ওনাকে এই সম্পর্কের কথা জানাতে চাইলেও তা পারছে না। তবু তাকে তো আমি ভালোবাসি। কিভাবে এক মুহূর্তে সব ভুলে অন্য কারোর হয়ে যেতে দিই তাকে! কী করে একসাথে কাটানো সকল স্মৃতিগুলোকে মনের ভেতর আচমকা বন্দী করে দিই। তাও আমার এই বুক ভরা কষ্টকে চেপে রেখে বললাম, 'তোমার মনের সব কষ্টের কথা আমি বুঝতে পারছি। আর তুমি যা চাও সেটাই হবে।' এই মুহূর্তে সবকিছু ভুলে জড়িয়ে ধরলাম একে অপরকে, দুজনেরই চোখের বাঁধ ভেঙে অশ্রুধারা বয়ে চলে, উভয় হারিয়ে গেলাম স্মৃতির শহরে। মনের গভীরে বুঝতে পারছিলাম এই আমাদের

কাছাকাছি আসার অন্তিম মুহূর্ত, এই মুহূর্ত আর কোনদিনও উভয়ের জীবনে ফেরত আসবে না। তাই এই মুহূর্তকে ছাড়তে চাইছিলাম না কেউই। শেষবারের মতন হাতে হাত ধরে ছাড়তে গেলাম তাকে। বাসটি যখন এসে পৌঁছালো মনে হলো, এই বৃষ্টির দিনে আমরা দুই পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিলাম অন্ধকার আকাশে আর শিকারী এই অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ডাল ফেলে ধরে নিয়ে চলে গেল আমার সঙ্গিনীকে।

৪

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম সবার থেকে। ক্লাসে একই সাথে থাকলেও মনে হতো আমি একা। কেউ হাসির কথা বা ঠাট্টা করলেও হাসি পায় না। পরীক্ষার দিন আমি আর নন্দিনী পাশাপাশি বসলেও মনে হল আমরা কত শত মাইল দূরের বিচ্ছিন্ন দুই নক্ষত্র। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে পেলাম নন্দিনীর বিয়ের খবর। ইতিমধ্যেই ফোন করলেন নন্দিনীর মা। ব্যক্তিগতভাবে জানালেন, 'আমাকে নন্দিনীর বিয়েতে যেতেই হবে, না গেলে বিয়ে হবে না। নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, 'ভালই তো। বিয়ে না হলেই ভালো হবে।' কাকিমা বলে উঠলেন, 'সবসময় দুষ্টুমি, তাহলে আমার মেয়েকে কে বিয়ে করবে?' উত্তর দিলাম, 'কেন আমি তো আছি। আমি থাকতে আর ভয় কীসের?' এই কথাটি শোনার পর কাকিমা চুপ হয়ে গেলেন। তাই বলে উঠলাম 'কী হলো কাকিমা ভয় পেলেন নাকি। মশকরা করছি চিন্তা করবেন না আপনার মেয়েকে আমি কেন কেউই বিয়ে করবে না। ও যা বদমেজাজি কে বিয়ে করবে ওকে। কাকু ভাগ্যবশত পাত্র পেয়ে গেছেন তাই আপনাদের সৌভাগ্য।' কাকিমাও বলে উঠলেন, সে তো জানি তুমি মজা করছো। তাহলে এসো কিন্তু বাবা, না এলে কিন্তু হবে না।' ফোন রাখার পর ভাবতে থাকলাম এই বদমেজাজি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম একদিন। বন্ধুরা নন্দিনীর বিয়ের খবর পাওয়ার পরই আমায় ফোন করে নানাভাবে আটকাবার প্রয়াস করতে থাকলো। নানা কারণ দিতে লাগলো। তবুও আমি যাবার কথায় অটল থাকলাম। তাকে হয়তো এই শেষবার চোখের দেখা দেখতে পাবো তা প্রত্যাখ্যান করি কি উপায়? দেখতে দেখতে চলে এল বিয়ের সপ্তাহ, আগের দিন বিকালে পৌঁছালাম নন্দিনীর বাড়ি। আমাকে দেখে কাকু কাকিমা যতটা খুশি হয়েছিলেন ততটা খুশি নন্দিনীকে মনে হলো না। নানা রকমভাবে মনের হতাশা ও নিরাশাকে লুকিয়ে রাখতে পারলেও, চোখের অনুভবকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। দুজনেই একে অপরের কাছাকাছি আসতে চাইলেও এখন আমাদের মাঝে এক নতুন সম্পর্কের রেখাচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যায় সবার সাথে চললাম ঘাট নিমন্ত্রণ করতে। এসে বিয়ের তত্ত্ব সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পরলাম। যাতে কোনভাবেই পুরাতন স্মৃতিগুলো এসে হানা না দেয়। পরের দিন সকালে হলো নান্দীমুখ।দুপুরে বরের গাড়িতে এলো বিয়ের তত্ত্ব আর এল হলুদ। শুরু হলো গায়ে হলুদ রসম। সবাই তার গায়ে হলুদ দিলেও আমি দিতে সাহস পাই না। কাকিমা এসে জোর করে নিয়ে গেলেন গায়ে হলুদ দেবার জন্য। হলুদ দিতে গিয়ে যখন স্পর্শ করলাম তার হাতটিকে ফিরে পেলাম সেই হাত যা এক সময় আমার পরিচিত ছিল, এখন সেই হাতটাই কতখানি অপরিচিত হয়েছে। উভয়ের চোখের

কোণেই তখন জল ছলছল করছে। কিন্তু ভিড়ের মাঝে সেই জল আটকা পড়েছে চোখের কোণেই। এতক্ষণে বন্ধুরা এসে পৌঁছায় বিয়ে বাড়িতে, আমাকে ডাকা মাত্রই চলে গেলাম হলুদ রসম ছেড়ে। সন্ধ্যায় কাকিমা পাঠালেন নব বরকে আনার জন্য। আবারও বন্ধুরা বলে উঠলো, 'যাস না রে, কাকিমাকে বলে দে তুই যেতে পারবি না।' কিন্তু আমি আর কার কথা শুনি। আমি জানতাম আমি যতক্ষণ নন্দিনীর সামনে থাকব ওর চোখের জল কোনোভাবেই শোকাবে না। তাই রওনা দিলাম বরের বাড়ির উদ্দেশে। সেখানে আশীর্বাদ পর্ব সেরে নিয়ে এলাম বরকে। গাড়ি থেকে নামা মাত্রই আবারও কাকিমা আবদার করলেন 'তোমাকেও কিন্তু নন্দিনীকে বিয়ের পিঁড়িতে করে আনতে হবে।' 'ঠিক আছে' বলে নিয়ে আসতে গেলাম নন্দিনীকে। নববধূর সাজে নন্দিনীকে দেখতেই পুরাতন স্মৃতিগুলি ফিরে পেলাম। ওকে আমি আজীবন এইরকম বিয়ের সাজেই কল্পনা করে এসেছিলাম। বিয়ের পিঁড়ি তোলার সময় যখন সে আমার কাঁধে হাত দেয়, আবারও খানিকের জন্যে ফিরে পেলাম সেই চেনা-পরিচিত মানুষটির স্পর্শ। আর বুঝতে পারলাম এই আমাদের অন্তিম মুহূর্ত যখন আমরা একে অপরের এত কাছাকাছি আসতে পারলাম। ফিরে পেলাম কালো মেঘের মতো চুলের সুগন্ধটিকে, নিয়ে চললাম নব বরের সাথে বিয়ের উদ্দেশ্যে। বিয়ের পিঁড়িতে করে নিয়ে যাবার সময় আমরা দুজন কোনভাবেই একে অপরের থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি না। বিয়ের মন্ডপে পৌঁছালাম, সাত পাক হলো, শুভদৃষ্টিও হলো। বিয়ের মন্ডপে বসিয়ে সবার নজর এড়িয়ে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। এই ছিল আমাদের সম্পর্কের অন্তিম গন্তব্যস্থল। এতক্ষণে আমার মনের গভীরে চেপে রাখা কষ্টের জোয়ার রূপ নিয়েছিল ঘূর্ণিঝড়ের। এখনো মেনে নিতে পারিনি সে অন্য কারো হয়ে যাচ্ছে। আর তাই সিঁদুর সম্প্রদান দেখতে চাইনি বা পারিনি আমি। যাত্রাপথে মনে হতে থাকলো, শিকারি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার ভালোবাসা, আমার প্রাণকে খাঁচায় বন্দী করে নিয়েছে।

৫

নন্দিনীর বিয়ের পর গত দুমাসে কারোর সাথে কথা হয় না। ভালো কথাতেও হয়ে উঠি বদমেজাজি। কিছুতেই কিছু আর ভালো লাগে না। সর্বদাই বোধ হয় আমার এক অংশ রয়ে গেছে সেই বিয়ের মন্ডপে। এক বসন্তের সকালে হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটি, অপরিচিত সব কিছুর মাঝে খুঁজেপেলাম পরিচিত নম্বরটি। এক মুহূর্তে ধরে ফেললাম ফোনটা। শুনতে পেলাম পরিচিত গলায় চেনা সুরটি। ফোনের ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, 'কীরে আগামীকাল রবীন্দ্রসরোবরে দেখা করতে আসবি! সেই তোর আমার পরিচিত জায়গায়।' দুঃখ বেদনাকে চেপে রেখে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ ঠিক আছে, কেন দেখা করবো না।' সময় ঠিক করে পরের দিন গিয়ে পৌঁছলাম তার আর আমার স্মৃতি আর ভালোবাসার স্থানে। এখান থেকেই আমাদের পথচলা শুরু, আর এখানে এসেই পথচলা শেষ। যে দিকেই নজর যায় খুঁজে পাই

পুরাতন স্মৃতিগুলোকে। এরই মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল চেনা মুখটি এক নতুন বেশে। দুজনে গিয়ে বসলাম বেঞ্চিটিতে। প্রথমে কেউ কিছুই বলে উঠতে পারলাম না, হারিয়ে গেলাম স্মৃতির শহরে। নিস্তব্ধতা ভেঙে নন্দিনী বলে উঠলো, শুনলাম তুই নাকি বদমেজাজি হয়ে গেছিস। ওটাতো আমার দপ্তর। আমি নেই বলে তা পূরণ করছিস নাকি?' বললাম, ' আরে না না কই বদমেজাজি হয়েছি, আমি সেই একই রকম রয়েছি।' উত্তরে এলো 'বদমেজাজি হয়েছিস সেটা মামনি আমাকে বলেছে, কিন্তু যে মিথ্যা কথা বলতে শিখেছিস সেটা তো আমাকে বলেনি।' মামনি আমাদের দুজনেরই ভালো বন্ধু, আমাদের দুঃখে সবসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আজও সে আমার দুঃখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমার সামনে নন্দিনীকে নিয়ে এসে। তাই বললাম, 'মামনি বলেছে বুঝি তুই আমার সাথে দেখা করতে এসেছিস।' তখন জানতে পারলাম নন্দিনী বিয়ের পর রীতিমতো প্রতিদিনই আমার খবর নিত বন্ধুদের কাছ থেকে। ওর আশা ছিল, ও আমার সাথে দীর্ঘ দিন কথা না বললে আমার ওর প্রতি আসক্তি কমতে থাকবে, আর তা ঘৃণায় পরিণত হবে। আর ওকে ভুলে যাবো। তবে ও এটা ভাবে নি যে এই বেপরোয়া আমায় মানসিকভাবে বদলে দেবে, বদমেজাজি করে তুলবে। এতক্ষণে আবারো সেই পরিচিত স্বরে বলে উঠলো, 'দেখ আর কতদিন এইভাবে অবহেলায় কাটাবি। কলেজের সবাই জানতো আমাদের ভাগ্যে মিল লেখা নেই, তাই আমাদের প্রেমকে নাম দিয়েছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। আর তুই সেটা মেনে নিতে পারছিস না। রাধা যেমন কৃষ্ণকে পায়নি, তেমনি আমরা একে অপরকে পেলাম না। কিন্তু রাধার পরিবর্তে কৃষ্ণ রুক্মিনীকে তো পেয়েছিল। তাই এবার আর এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দে না, হয়তো সেখানে আরও ভালো স্মৃতি ও মুহূর্ত অপেক্ষা করে আছে তোর জন্য। আমাকে না হয় পেলি না কিন্তু আমাদের কাটানো মুহূর্তগুলো, স্মৃতিগুলো তো তোর কাছে আছে, তার ওপরতো আর কারো অধিকার নেই, শুধু তোরই অধিকার। এই স্মৃতিগুলোর উপর ভর দিয়েই যাত্রা দেনা নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে।' এরপরই আমি বুঝতে পারলাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ভালোবাসা। সত্যিই তো কত মানুষ ভগবানকে ভালোবাসে, কেউ বন্ধু হিসাবে, কেউ সন্তান মনে করে, আবার কেউ নিজের প্রেমিক বা প্রেমিকা ভেবেছে। কিন্তু তাদের তো মিলন হয় না। তাহলে কি মানুষ ও ভগবানের প্রেম-ভালোবাসা মিথ্যা না। কোনোভাবেই তা মিথ্যা নয়। কেউ কাউকে সত্যি ভালবাসলে একে অপরের সাথে না থাকলেও তাকে ভালোবাসা সম্ভব। ভালোবাসাকে যুক্তি বা সংজ্ঞার মধ্যে ধরে রাখা অসম্ভব। ভালোবাসা নিজেই নিজের মধ্যে সফল এবং স্বতন্ত্র। যখন মানুষ জীবনের ছুঁচালো ধারালো আঁকা-বাঁকা পথে দৌড়াতে দৌড়াতে, হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে ধাক্কা খায় দুঃখ নিরাশার দেওয়ালে, এসে দাঁড়ায় জীবনের কঠোর হতাশার মুহূর্তে, যখন এরপর কী - এই প্রশ্ন হানা দেয় মনে তখন আমরা দপ দপ করে জ্বলতে থাকা ক্ষীণ আলোর প্রদীপ নিয়ে হাঁটা দিই ভালোবাসার সুন্দর ও মধুর স্মৃতির শহরের অলিতে গলিতে। আবারো ফিরে পাই জীবনের ছুঁচালো ধারালো আঁকা-বাঁকা পথে হাঁটার শক্তি, খুঁজে পাই উজ্জ্বল দীপ্তিময় আশার আলোকে।

লকডাউনের প্রভাব

নীলাব্জ মুখার্জী
এম. এ (প্রথম সেমেস্টার)

মহামারী জিনিসটার সঙ্গে ২০২০ সালের আগে আমরা কেউই পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু ২০২০ সালে আগত করোনা ভাইরাস আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে মহামারী জিনিসটা আসলে কতটা ভয়ঙ্কর! এই মহামারীকে রুখতে বিশ্বের সমস্ত দেশই নানা রকমের ব্যবস্থা নিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান হল লকডাউন। করোনার কারণে হওয়া এই লকডাউন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষজনের খুঁটি নড়িয়ে দিয়েছিল। ২০২০ সালের ২৪শে মার্চ ঘোষিত লকডাউন যার প্রভাব অর্থনীতি, সমাজে, পড়াশোনায়, শিক্ষার্থীদের, এছাড়া নানা বিষয়ের উপর খুব বড় রকমের ছাপ ফেলেছিল যা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

একটা দেশ মূলত যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে তা হল অর্থনীতি, লকডাউন হওয়ার ফলে সমস্ত অফিসকাছারি, কল-কারখানা বন্ধ থাকার কারণে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রচুর প্রভাব পড়েছে। যার ফলে প্রায় সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রচুর ছেলেমেয়ে বেকার হয়ে গেছে, যার ফলে দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়াও যে সমস্ত ছোটো ছোটো ব্যাবসাগুলো সবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল সেইগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে।

এই লকডাউনের ফলে যে জিনিসটার সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা হল শিক্ষাব্যবস্থা। দীর্ঘদিন স্কুল -কলেজ বন্ধ থাকার কারণে অনেক পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। এছাড়া স্কুলে কলেজের প্রায় সমস্ত পরীক্ষাই অনলাইন মাধ্যমে শুরু হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা থেকে মনোযোগ উঠে যায়। তারা বেশি মুঠোফোনের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে।

হঠাৎ করে লকডাউন হওয়ার কারণে যে সকল ব্যক্তিরা অন্য রাজ্যে চাকরি করত তাদের বাড়ি ফিরতে প্রচুর অসুবিধা হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থা ঠিক না থাকার কারণে অনেক মানুষ তার পরিবারকে নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরেছে, যা কিছুটা হলেও ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ঘটে যাওয়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এছাড়াও লকডাউন কিছুটা হলেও মানুষকে অলস করে দিয়েছে। তবে সমস্ত জিনিসেরই ভালো এবং খারাপ দুটো দিকই থাকে। তেমনই লকডাউনের ভালো দিকগুলো হলো - লকডাউনে সমস্ত মানুষ তার পরিবারের সাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছে, যেটা দৈনন্দিন ব্যস্ত জীবনে ছিল না। লকডাউন মানুষকে শিখিয়েছে যে কঠিন পরিস্থিতিতে কী ভাবে মানিয়ে নিতে হয়।

সবকিছু মিলিয়ে সর্বশেষ একটা কথাই বলা যায় ২০২০ সালের এই লকডাউন আমাদের সকলের কাছে এক অন্যতম স্মৃতি হয়ে থাকবে।

ফ্রি ফায়ার ও পাবজি নামক অনলাইন গেমে ঝুঁকেছে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র যুবকেরা, অজান্তেই তারা শিকার হচ্ছে মরণ নেশায়।

প্রিন্স বিশ্বাস
শিক্ষক, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

ফ্রি ফায়ার ও পাবজি নামক অনলাইন গেমে ঝুঁকেছে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র যুবকেরা, অজান্তেই তারা শিকার হচ্ছে মরণ নেশায়। Covid পরিস্থিতিতে দৈর্ঘ সময় স্কুল,কলেজ সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন ৬ থেকে ১৪ বা ২১ বছর বয়সের সকল শিক্ষার্থীরা। অনেক বাবা মায়েরা না চাইলেও এই সময় তার সন্তানদের (অনলাইন নামক ক্লাসের অজুহাতে) Android mobile phone কিনে দিতে বাধ্য হয়েছে, সেই সঙ্গে রিচার্জ করে দিচ্ছে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের নেট প্যাক। আর এই সুযোগে দিন দিন ইন্টারনেট ফাইটিং ফ্রি ফায়ার ও পাবজি গেমে ঝুঁকছে কিশোর যুব সমাজ। জানা যায় চীনের এক গেম প্রস্তুতকারক সংস্থা ২০১৯ সালে তৈরি করে যুদ্ধ গেম ফ্রি ফায়ার ২০১৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান ব্লু হোয়েলের অনলাইন ভিডিও গেমটির মতোই তরুণ প্রজন্মের কাছে যা আশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। করোনায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অলস সময়ে এ গেমসে জড়িয়ে পড়ছে কিশোর যুব সমাজ। মূলত উঠতি বয়সের শিক্ষার্থীরা ও পুরো যুব সমাজ দিন দিন ফ্রি ফায়ার ও পাবজি নামক গেমের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। যে সময় তাদের ব্যস্ত থাকার কথা নিয়মিত পড়া লেখা সহ শিক্ষা পাঠ গ্রহণ নিয়ে ও খেলার মাঠে ক্রীড়া চর্চার মধ্যে, সেখানে তারা ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে জড়িয়ে পড়ে নেশায় পরিণত করছেন। ৮ বছর থেকে ২১ বছরের উঠতি বয়সের যুবকরা প্রতিনিয়ত অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে এসব গেইমে আসক্ত হচ্ছে। এমন কি মাঝে মধ্যে দেখা য়ায় বেশ কয়েকজন মিলে এই গেমের ট্রুনামেন্টের আয়োজন করতে। এই সব বিদেশী গেম থেকে শিক্ষার্থী বা তরুণ প্রজন্মকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে বড় ধরণের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাবে সমাজ ব্যাবস্তায়। শুধু খেলায় ক্ষান্ত হয়েই থাকে না এরা ইউসি ক্রয় ও ডায়মন্ড টপ আপের নামে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, পাবজি ও ফ্রি ফায়ার নামক মরন গেমস। এই ভাবে অজানা বিদেশি কোম্পানি হাতিয়ে নিচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা। একজন অসচ্ছল পরিবারের সন্তান ডায়মন্ড ও ইউসি কেনার টাকা যোগান দিতে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপকর্মে। মাদক বিক্রয় ও কিছু টাকার বিনিময়ে মাদক সেবিদের কাছে মাদক পৌছে দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম মাধ্যম। একসময় যে সকল শিশুরা ১০ টাকা / ২০ টাকা জমিয়ে যেখানে ক্রিকেট বল ফুটবল কিনত, সেখানে তারা টাকা জমিয়ে রাখছে ইউসি / ডায়মন্ড কেনার জন্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ফ্রি ফায়ার গেমে অনুরাগীরা জানান, ‘প্রথমে তাদের কাছে ফ্রি ফায়ার গেম ভালো লাগত না। কিছুদিন বন্ধুদের দেখাদেখি খেলতে গিয়ে এখন তারা আসক্ত হয়ে গেছে। এখন গেম না খেললে তাদের অস্বস্তিকর মনে হয় বলে জানায় । আরেক জন ১০ম শ্রেনীর শিক্ষার্থী জানায়, ‘সে আগে গেম সম্পর্কে কিছু জানত না। এখন নিয়মিত ফ্রি ফায়ার গেম খেলে। মাঝে মধ্যে গেম খেলতে না পারলে মুঠোফোন ভেঙে ফেলার ইচ্ছাও হয় তার। সে আরো বলে,

ফ্রি ফায়ার গেম যে একবার খেলবে সে আর ছাড়তে পারবে না বলে দাবি করে। এই ধরনের ফ্রি ফায়ার ও পাবজি নামক গেম মাদকদ্রব্যর নেশার মত ভয়ঙ্কর। আমাদের শৈশবে আমরা অবসর সময়টি বিভিন্ন খেলা ধুলার মধ্যে দিয়ে পার করতাম, কিন্তু এখনকার প্রজন্ম সন্তানদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। শহরতলি ছাড়িয়ে এখন জেলার গ্রাম-গঞ্জে মোবাইল ইন্টারনেটে 'গ্রুপ গেম' মহামারী আকার ধারণ করেছে।

শিক্ষার্থীরা অনেকেই পড়ার টেবিল ছেড়ে খেলছে 'মোবাইল গেম', আবার কখনো ইন্টারনেটের খারাপ সাইটে বিভিন্ন ছবি দেখছে। এতে একদিকে তাদের ভবিষ্যৎ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। গবেষনায় প্রমানিত এসব গেম শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। গেমে জিততে না পেরে সারাদিন ডিপ্রেশনে থাকা, বা ডিপ্রেশন থেকে সুইসাইড ও পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ ব্যাবহার করা তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিনত হয়েছে।

এটা আচরণগত আসক্তি:

যদিও গেম আসক্তি বিষয়টি ইন্টারনেটে আসক্তি থেকে খানিকটা আলাদা। কখনো দেখা যায় ইন্টারনেটে কেউ অতিরিক্ত পরিমাণে গেম খেলছে, কেউ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত, কেউবা নানা সফটওয়্যার বা এসব নিয়ে মশগুল আর কেউবা ফেসবুকসহ নানান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করছে দিনের বেশির ভাগ সময়। মোটকথা সবই হচ্ছে ননকেমিক্যাল অ্যাডিকশন বা আচরণজনিত আসক্তি। বিশ্বজুড়ে এই বিষয়ে প্রকাশিত ১৬টি গবেষণাপত্রের অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ৪.৬ % ইন্টারনেট গেমিংয়ে আসক্তিতে ভুগছে। যাদের মধ্যে ৬.৮% হচ্ছে কিশোর আর ১.৩% শতাংশ কিশোরী (জে ওয়াই ফ্যাম, ২০১৮)।

নিষিদ্ধ বিষয় নয়, তবে ক্ষতিকর:

ইন্টারনেট গেম খেলা নিষিদ্ধ নয় অধিকাংশ দেশে এমন কি আমাদের ভরতবর্ষেও নিষিদ্ধ নয়। এর ক্ষতিকর, অযৌক্তিক, অপরিমিত ব্যবহার চিন্তা আর আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে। এই ইন্টারনেটের ব্যবহার বা গেম খেলার বিষয়টি যখন তার চিন্তা আর আচরণের ওপর খারাপ ধরনের প্রভাব ফেলবে, সামাজিক দক্ষতা কমিয়ে দেবে বা দৈনন্দিন জীবনযাপনের মান খারাপ করে দেবে তখন তা আসক্তির পর্যায়ে চলে যায়।

যেভাবে বাড়ে আসক্তির প্রবণতা:

সন্তানকে শান্ত রাখতে মুঠোফোনসহ নানা যন্ত্রপাতি তাদের হাতে তুলে দেন ব্যস্ত মা–বাবারা। তাঁরা নিজেরাও মুঠোফোনে ব্যস্ত থাকেন। অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে সন্তানকে সব সময় নিজের চোখের সামনে দেখতে চান মা-বাবা। সে ক্ষেত্রে তাদের হাতে মুঠোফোন-ল্যাপটপ তুলে দিয়ে আপাতত স্বস্তি অনুভব করেন, যা শিশু-কিশোরদের ইন্টারনেটে আসক্ত করে ফেলে। বাবা-মা নিজেরাও যদি সারা দিন ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মগ্ন থাকেন তাহলেও সন্তানের মধ্যে আসক্তির প্রবণতা বেড়ে যায়।

কখন আসক্তি বলব:

ইন্টারনেট ব্যবহার করলেই সেটাকে নেতিবাচকভাবে নেওয়া যাবে না। দেখতে হবে সেটি আসক্তির পর্যায়ে চলে

গেছে কিনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য গবেষণা দলের মতে, গেমিং আসক্তির লক্ষণগুলো ১২ মাস ধরে থাকতে হবে। তবে লক্ষণ যদি গুরুতর ধরনের হয় তবে সেগুলো অল্প দিন ধরে লক্ষণ দেখা দিলে সেটাকেও গেমিং ডিজঅর্ডার বলা যাবে। কিছু লক্ষণ, ইন্টারনেট ব্যবহার বা গেম খেলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ ঘন ঘন খেলতে থাকবে, অনেক বেশি সময় ধরে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে এবং এত নিবিষ্টভাবে সেটিতে মগ্ন থাকবে যে চারপাশের অনেক কিছু তার মনোযোগ পাবে না।

★ দিনের শুরুই হবে ইন্টারনেট ব্যবহার বা গেম খেলার আকুতি দিয়ে, তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে গেম বা ইন্টারনেটের প্রতি। নতুন কিছুর চেয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকেই জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করবে।
★ দিন দিন ইন্টারনেটে গেম খেলার সময় বাড়তে থাকবে। যেমন আগে সপ্তাহে দুই দিন খেলত, এখন প্রায় প্রতিদিনই খেলে। আগে দিনে ১ ঘণ্টা কাটাত ইন্টারনেটে বা গেমে, এখন ৬ ঘণ্টা ব্যয় করে। চাইলেও নিজেকে গেম খেলা থেকে বিরত রাখতে পারে না।
★ জীবনের সব আনন্দের উৎস হবে ইন্টারনেট বা গেম। এগুলো ছাড়া সে আর কোনো কিছুতেই আনন্দ পাবে না।
★যে কাজগুলো করার কথা, যেমন: পড়ালেখা, অফিস, বাড়ির কাজ সবকিছু ব্যাহত হবে। পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে থাকবে। কাজের মান কমে যাবে। অফিসে দেরিতে যাবে।
★নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহার করতে না পারলে উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তিতে ভুগবে। খিটখিটে মেজাজ হবে। মন খারাপ লাগবে। আচরণ আগ্রাসী হয়ে উঠবে। দেখা যাবে কোনো কারণে ইন্টারনেট সংযোগ নেই, তাতে সে অস্থির হয়ে পড়ছে, রাগ করছে, চিৎকার করছে, ভাঙচুর করছে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠছে।
★ঘুমের সমস্যা দেখা দেবে। দিনে ঘুমাবে আর রাতে জাগবে।
★খাবার গ্রহণে অনিয়মিত হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় এমন খাওয়া গ্রহণ করবে, যেমন ফাস্টফুড। অর্থাৎ সময় নিয়ে খাবে না। বাসায় সবার সঙ্গে টেবিলে বসে না খেয়ে নিজের ঘরে বসে খাবে।
★মিথ্যা কথা বলবে। নিজের ত্রুটিগুলো ঢাকতে তথ্য গোপন করবে। স্কুল ফাঁকি দেবে বা ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়বে। কখনো ক্লসে ঝিমুবে।
★বাথরুমে বেশি সময় কাটাবে, বাথরুমে মুঠোফোন নিয়ে যাবে।
★ সামাজিকতা কমে যাবে। কারও সঙ্গে মিশবে না। নিজেকে গুটিয়ে রাখবে।চারপাশ ভুলে গিয়ে গেমে মগ্ন হওয়া গেমে আসক্তির লক্ষণ।

আসক্তির পরিণতি কী?
মূলত ইন্টারনেট গেম আসক্তি অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের (ইয়াবা, হেরোইন, গাঁজা, মদ ইত্যাদি) আসক্তির মতোই। পার্থক্য হচ্ছে এটি আচরণগত আসক্তি, আর অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের আসক্তি, রাসায়নিক আসক্তি। মস্তিষ্কের যে অংশে (রিওয়ার্ড সেন্টার) ইয়াবা বা গাঁজার মতো বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্ম নেয় ঠিক সেই অংশেই কিন্তু ইন্টারনেট বা গেমের প্রতি আসক্তি জন্মায়। তাই একে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই।

আসক্তির পরিণতি হচ্ছে—

★ পারিবারিক জীবন বাধাগ্রস্ত হবে। বাবা-মাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকবে। সামাজিক সম্পর্কগুলোর মূল্য কমতে থাকবে।

★ সামাজিক দক্ষতা কমে যাবে। সামাজিক অনুষ্ঠান বর্জন করার কারণে নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা কমে যাবে।

★ ব্যক্তিগত জীবন বাধাগ্রস্ত হবে। নিজের যত্ন কম হবে। অপুষ্টিতে ভুগবে, কারণ উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করবে না। পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হলে স্বাভাবিক যৌনজীবন নষ্ট হবে।

★ পড়ালেখা ও কর্মজীবনের মান কমে যাবে। মানসিক রোগও হতে পারে।

★কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, গেমিং ডিজঅর্ডারের সঙ্গে অতি উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা এবং তীব্র মানসিক চাপের মতো মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের সঙ্গে গেমিং ডিজঅর্ডার হওয়ার প্রবণতা কখনো বেশি পাওয়া গেছে।

এইধরনের গেম গুলিতে আসক্ত হয়ে, ইতিমধ্যে দেশে বহু কিশোরের আত্নহত্যার খবর এসেছে। মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছে বহু তরুণ। শরীরে বিষাক্ত টক্সিন জমা হতে হতে, শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করছে না অনেকেরই। হজমের সমস্যায় ভুগছে বহু কিশোর। মানসিক অবসাদে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। স্নায়বিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে! লালাগ্রন্থির নিঃসরণের ছন্দও হারিয়ে যাচ্ছে। খাদ্যনালীতে পর্যাপ্ত মিউকাস আসছে না। ফলে খাদ্য গলা দিয়ে নামতেও চাইছে না। খাদ্যনালীর পেরিষ্টোলিসিস মুভমেন্টও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সারাদিন মোবাইল নিয়ে ঘরে বসে এই গেম খেলার ফলে মাঠে খেলাধূলা বা শরীরচর্চাও উঠে গেছে পুরোপুরি। লেখাপড়ার বারোটাতো বেজেইছে। মেধা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাতে সঠিক সময়ে না ঘুমিয়ে নেশার কবলে পড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে রাত দু-টো-আড়াইটে পর্যন্ত চলছে এই খেলা। ফেল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঘুমও! গোলাগুলি নিয়ে খেলার ফলে শিশুদের মধ্যে হিংস্রতাও তৈরী হয়ে যাচ্ছে। মানবিক অনুভূতি মূলক গুণাবলী একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরকমটা চলতে থাকলে আগামী দিনে দেশের সীমানা পাহারা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীতেও যোগ্য ছেলেদের পাওয়া যাবে না। নেশার প্রকৃতি এতটাই তীব্র, যে বাবা-মা নিষেধ করলে বা ঐ অনলাইন গেম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করলেও সন্তান বেছে নিতে পারে আত্নহননের পথ। তাই অভিভাবকরাও নিরূপায় হয়ে পড়ছেন। এমনকি এইসব রোগের তেমন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাও এখনো বের হয় নি! এমন অবস্থায় দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম বিপন্ন।

প্রতিরোধের উপায় :

★ ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত না হলে, ইন্টারনেট সংযোগ বা ব্যক্তিগত মুঠোফোন নয়। সে নিজেকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তা আগে বিবেচনা করতে হবে।।

★সন্তানদের গ্যাজেট আর ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিলে তার একটি সময়সীমা বেঁধে দিন। সন্তানের সঙ্গে চুক্তিতে আসুন, যাতে নিয়মগুলো পালন করে। সময় মেনে চলতে উৎসাহিত করুন।

★ শিশু কিশোররা যাতে আপনার সামনে মুঠোফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে, সেদিকে গুরুত্ব দিন।

★নিরাপত্তামূলক অনেক সফটওয়্যার আছে। সেগুলো ব্যবহার করুন, যাতে আপনার বাসার সংযোগ থেকে কোনো নিষিদ্ধ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা না যায়। এ বিষয়ে আপনার ইন্টারনেট সংযোগদাতা বা প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন। সন্তান প্রযুক্তিতে অতি দক্ষ এই ভেবে আত্মতৃপ্তি পাবেন না। তার বয়সটি প্রযুক্তির উপযোগী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।

★ শিশুকে গুণগত সময় দিন। মা-বাবা নিজেরাও যদি প্রযুক্তির প্রতি আসক্ত থাকেন, তবে সবার আগে নিজের আসক্তি দূর করুন। পরিবারের সবাই মিলে বাসায় ক্যারম, লুডু, দাবা, মনোপলি ইত্যাদি খেলার চর্চা করুন। নিয়ম করে সবাই মিলে বেড়াতে যান। মাঠের খেলার প্রতি উৎসাহ দিন।

★ইন্টারনেট বা গেম আসক্তি কিন্তু মাদকাসক্তির মতোই একটি সমস্যা। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে এই আসক্তি দূর করুন।

শেষপাতে:

এই অনলাইন গেমগুলিতে যে নেশা হয়, তার ফলে মোবাইলে ডাটা প্যাক রিচার্জ করা বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এই অনলাইন গেম গুলিতে প্রচুর ডাটা-র আদান প্রদানও হয়। ফলে পুঁজিপতিদের ব্যবসার সুবিধা হয়। এই গেম বন্ধ করলে তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থক্ষুন্ন হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের International Classification of Disease বা আইসিডি’এর ১১তম সংস্করণে ভিডিও কিংবা অনলাইন গেমকে গুরুতর মানসিক অসুস্থতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। সংস্থাটি বলছে, কম্পিউটার বা ট্যাবে অনলাইন গেমের কু-অভ্যাসের কারণে মস্তিষ্কের কোষে কিছু রাসায়নিক নির্গত হয়। যা আমাদের স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। সেটি ক্ষতিকর না হলেও দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে একধরনের মানসিক নেশা তৈরি হয়। যা ব্যবহার, মনোসংযোগ এবং দিনের কাজকর্মে প্রভাব ফেলে। সংস্থার মতে, এই পরিবর্তনই গেমিং ডিসঅর্ডার সমস্যার মূল কারণ। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছুটা তরতাজা হওয়ার জন্য খেললেই যে এমন অসুস্থতা আসবে তা কিন্তু নয়। তবে তা সীমা লঙ্ঘন করলেই সমস্যা। এটি অন্যান্য নেশার মতোই মনের জন্য ক্ষতিকর। তাই সুস্থ থাকতে আজ থেকেই অনলাইন গেম’এ রাশ টানা উচিৎ।

(মতামত ব্যক্তিগত)।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর ক্রমবিকাশ –

রাণু অধিকারী
প্রাক্তন ছাত্রী

রবীন্দ্রবিশ্বের নারীরা পুরুষের ছায়ামাত্র নয় যা সে যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই স্বাভাবিক বলে গণ্য হতে পারত। বরঞ্চ যুগের তুলনায় আশ্চর্যরকম অগ্রসর তার নারী চরিত্ররা। হয়তো ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে এমন অনেকের দেখা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বলেই সাহিত্যে এমন স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নারী চরিত্রের সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের নারীরা বিচিত্রগামী। গ্রাম্য বালিকা, কৃষক পরিবারের গৃহবধূ, স্বদেশী বিপ্লবী, অবাঙালি ও সংস্করণমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক নারী, স্বাধীন চাকরিজীবী নারীর ছবি তিনি এঁকেছেন। এই বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যেও গল্পগুচ্ছের এমন পাঁচটি নারী চরিত্র চোখে পড়ে যারা একে অন্যের প্রায় প্রতিরূপ। তবে পাঁচটি ভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে এরা এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যে একথা ধারণা করা যায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই পাঁচটি গল্পের ভিতর দিয়ে নারীর মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। তার চিন্তায় নারীর মুক্তির পথ যত বিকশিত হয়েছে গল্পগুলোর মধ্য দিয়েও নারীর স্বাধীনতার পথ তত উন্মোচিত হয়েছে।

নিরুপমা, হৈমন্তী, মৃণাল, কল্যাণী, অনিলা এই পাঁচজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি বিখ্যাত ছোটগল্প ‘দেনাপাওনা’, ‘হৈমন্তী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘অপরিচিতা’ ও ‘পয়লা নম্বর’ এর নায়িকা।

‘দেনাপাওনা’ গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত বাবা রামসুন্দরের আদরের মেয়ে নিরূপমা, জমিদার রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকা পণ স্বীকার করেন বাবা। নিরূপমা সুন্দরী, কিন্তু সেই রূপের কোন কদর বা আদর তার শাশুড়ির কাছে নেই। চাকুরিরত স্বামী থাকে শহরে। প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার স্বামী শরৎ ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কেন মোটা অঙ্কের যৌতুক দিয়েই মাধুরীলতার বিয়ে দিয়েছিলেন কবি। স্বামীর ভালোবাসা পেলেও নিঃসন্তান মাধুরীলতার শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীত ছিলেন। মাধুরীলতা যখন ক্ষয়রোগে ভুগছেন তখন শ্বশুরবাড়িতে তার অমানবিক অবহেলায় দুঃখ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমরা দেখি, পণের পুরো টাকা দিতে পারেনি বাবা। তাই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ির প্রবল নির্যাতনের শিকার। মেয়েকে সুখী করতে শেষে বাড়ি বিক্রি করে দেন বাবা। কিন্তু নিরুপমা টাকা দিতে বাধা দেয়। “টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই! আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না” – এই সংলাপে নিরুপমার ব্যক্তিত্ব ঝলসে উঠতে দেখা যায়।

নিরুপমার চেয়ে বিকশিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হৈমন্তী। সে শৈশবে মাতৃহীন এবং বাবার

আদরের মেয়ে। হৈমন্তীর মধ্যেও অনেকটা মাধুরীলতার ছায়া দেখতে পাই। হৈমন্তীও সুন্দরী। সে তার বাবার সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলে মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েছে। তার বাবা গৌরসুন্দর যেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ। বাবা-কন্যার মধ্যে স্নেহ ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যেও কবি ও কবিকন্যার প্রতিফলন দেখা যায়। হৈমন্তীর স্বামী অপু তাকে ভালোবাসলেও শ্বশুরবাড়িতে অবহেলার শিকার এই তরুণী। গৌরসুন্দর পণের টাকা পুরোই পরিশোধ করেন। কিন্তু গৌরসুন্দর সম্পর্কে প্রথমে অপুর বাবা-মায়ের ধারণা ছিল তিনি অনেক বড় চাকুরে ও ধনী। কিন্তু দেখা গেল তিনি তাদের আশানুরূপ ধনী নন। একই বিষয় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল তার বেহাই বাড়িতে। ঠাকুর পরিবারের সন্তান ও জমিদারির প্রধান পরিচালক রবীন্দ্রনাথ প্রবল ধনী হিসেবে সমাজে পরিচিতি থাকলেও, তিনি তার সব সম্পত্তি দিয়ে শান্তিনিকেন প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য স্বল্প টাকারই অধিকারী ছিলেন। হৈমন্তীর মতো মাধুরীলতাও বেড়ে উঠেছিলেন শিলাইদহের প্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন পরিবেশে।

নিরুপমার চেয়ে হৈমন্তী মানসিকভাবে আরও অনেক দৃঢ় চরিত্রের হৈমন্তী সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিলেও অমপানের কন্টক শয়নে থাকায় ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে একসময় মৃত্যু হয় এই প্রবল আত্মবিশ্বাসী নারীর। হৈমন্তী বেঁচে থাকতে তার প্রাত্যহিক নিপীড়ণের গন্ডি থেকে বের হতে পারেনি। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছিল মৃণালের দ্বারা।

স্ত্রীর পত্রের মৃণাল বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। মৃণাল অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে। তার বাবার বাড়ি পূর্ববঙ্গের গ্রামে। ‘বাঙাল দেশের রান্না’ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অনেক অপমান সহ্য করতে হয় তাকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবিপত্নী মৃণালিণীর কথা। তিনিও খুলনার গ্রামের বাড়ির মেয়ে, তাকেও অভিজাত ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে অনেক বাঁকা কথা শুনতে হয়েছিল। জমিদার পরিবারের মেজ বউ মৃণাল ছিল অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু সে যে সুন্দরী সেকথা শ্বশুরবাড়ির লোকরা দ্রুত ভুলে গেলেও সে যে বুদ্ধিমান সেটা তারা ভুলতে পারেনি।

মৃণাল সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধির অধিকারিণী। অন্যায়ের প্রতিবাদে সদা সোচ্চার মৃণালকে প্রতিপদে শ্বশুরবাড়িতে হেয় হতে হয়। তবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মৃণাল সেসব তুচ্ছ করে তার প্রতিবাদী ভূমিকা ধরে রাখে। অসহায় নিরাশ্রয় মেয়ে বিন্দুকে নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করে মৃণাল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সাথে। শেষ পর্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত বিন্দু আত্মহত্যা করে। সংসারে নারীর অবস্থান যে কত দুঃসহ তা নতুনভাবে উপলব্ধি করে মৃণাল। একসময় সাংসারিক বন্দিদশা থেকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয় মৃণাল। সে পুরীর তীর্থক্ষেত্রে চলে যায়। বাঙালি ঘরের একজন কুলবধূর এই সাহসী ভূমিকা ছিল চমকপ্রদ। মৃণাল নিজেই বলে সে আত্মহত্যা করবে না বরং স্বাধীনভাবে বাঁচবে।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অন্বেষণ করেছিলেন নারীর মুক্তির পথ। সে কি সংসারের যাঁতাকালে পিষ্ট হতেই থাকবে? ‘রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার চক্র থেকে নারীকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু সেই মুক্তি কি কেবল ধর্মের পথে? না তা নয়, নারীর মুক্তি তার স্বাধীন জীবনে। সেই স্বাধীনতা কী ভাবে পাওয়া যায় সেই পথই খোঁজে ‘অপরিচিতা’র কল্যাণী। ‘অপরিচিতা’ গল্পটিতে

আবারও আমরা দেখতে পাই এক বাবা ও তার আদরের মেয়েকে। কল্যাণী সুন্দরী ও শিক্ষিতা। তার বাবা ডাক্তার শম্ভুনাথ অনেকটাই হৈমন্তীর বাবা গৌরসুন্দরের মতো। তিনিও বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃহীনা কন্যাকে নিয়ে থাকতেন। তবে বাবা ও মেয়ে দুজনেই তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ় মনোভাবের।

কল্যাণীর বিয়ের আসরে যৌতুকের টাকা ও অলংকার যাচাই করতে চান পাত্রের মামা বরকর্তা হিসেবে, এবং যাচাই করে দেখা যায় প্রতিশ্রুত পরিমাণের চেয়ে শম্ভুনাথ বেশিই দান করেছেন। পাত্রপক্ষ সন্তুষ্ট হলেও অপমানিত শম্ভুনাথ মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি পাত্রপক্ষকে বিয়ের আসর থেকে বিদায় করে দেন। কল্যাণীও নারী শিক্ষায় ব্রত গ্রহণ করে সমাজ সেবার কাজে ব্রতী হন।

বিয়ের আসরের এই গন্ডগোল কিছুটা আভাস আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের ছোটমেয়ের বিয়ের আসরের ঘটনায়। মীরা দেবীর স্বামী ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। বিয়ের আসরে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাথে অভদ্র ব্যবহার করেন। মীরাদেবীর অসুখী দাম্পত্যজীবন রবীন্দ্রনাথকে সবসময়ই পীড়া দিত। এবং তিনি প্রায়ই ভাবতেন যে যদি আসরেই বিয়েটি বন্ধ করা যেত তাহলে হয়তো পরবর্তীতে এত কষ্টভোগ করতে হত না। এই ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে 'অপরিচিতা'য়। কল্যাণী নিজের এবং অন্য অনেক নারীর মুক্তির পণ খুঁজেছে। নারীর মুক্তি কোথায়, ঘরে, সংসারে, প্রেমে, ধর্মে না সমাজসেবায়?

কোন অবলম্বন ছাড়া কি স্বাধীনভাবে নারী বাঁচতে পারে না? অবশ্যই পারে। 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা তাই ত্যাগ করে স্বামীর ঘর।

অনিলাও ছিল বাবার আদরের মেয়ে তার স্বামী অদ্বৈত ছিল স্ত্রীর প্রতি উদাসীন। নিজের পড়াশোনা ও বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত। অনিলার পাশের বাড়ি অর্থাৎ গলির মোড়ের পয়লা নম্বর বাড়িতে বাস করতো সুদর্শন ধনী জমিদার সীতাংশু মৌলী সে অনিলার প্রেমে পড়ে, তাকে একের পর এক চিঠি পাঠায়। কিন্তু অনিলা কোন সাড়া দেয় না। এদিকে অনিলার একমাত্র ভাই আত্মহত্যা করে। কিন্তু উদাসীন স্বামী সে খবরটুকুও রাখে না। এরপর একদিন সংসার ত্যাগ করে অনিলা। স্বামী মনে করে সে সীতাংশুর সঙ্গেই চলে গেছেন কিন্তু অনেক বছর পর সে জানতে পারে অনিলা কোনো পুরুষের হাত ধরেনি। সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছে। অনিলা যেমন তার স্বামীকে চিঠি লিখে গেছে 'আমার খোঁজ করো না', তেমনি সেদিন সীতাংশুকেও জীবনে একটিমাত্র চিঠিতে একই কথা লিখে গেছে।

একজন পুরুষ হয়ে নারী মনের আনাচে কানাচে অবাধ প্রবেশ করতে সক্ষম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃত প্রেমিকপ্রবর রবীন্দ্র চেতনায় নারী নিছক দেহমাত্র নয়। এক সজ্ঞান সচেতন অনুভূতিশীল সর্বোপরি স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা। নারী হৃদয় অতলে অবগাহন করে কবিগুরু নারীকে শুধু অন্তঃপুরবাসিনী কন্যা-ভগিনী-জায়া বা মাতা হিসাবে নয়, প্রকৃত মানবসত্তায় পুরুষের সহযাত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করাতে চেয়েছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে স্বাধীন ও ক্ষমতায়িত জীবনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তি। এক নারীর পাশে দাঁড়াতে হবে অন্য নারীকে। মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে এর গত্যন্তর নেই।

নমঃশূদ্র সমাজে প্রচলিত গান -- একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শুক্লা বিশ্বাস
নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

গান করা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি, অনুমান করা হয় ভাষা লেখার পূর্বেই মানুষ গান করা শিখেছে। এই গান বা সংগীত মানুষের কর্মে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তাদের হৃদয়ের নানাবিধ ভাব-আনন্দ, দুখ-বেদনা, কামনা, ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রভৃতি প্রকাশে সহায়তা করেছে। আদিম অরণ্যজীবী মানুষ থেকে আধুনিক নাগরিক মানুষের বিবর্তনের ধারায় লক্ষ্য করা যায় মানব হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি সহজ-সরল আঞ্চলিক ভাষায় অতি সাধারণ জনগণ তাদের সুরের ঝংকারে ফল্গুধারার মতো বয়ে নিয়ে চলেছে সেই সাথে সাধারণ মানুষের সমাজ-পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ইতিহাসের সাক্ষী রেখে গেছে। এই লোকের দ্বারা স্বতস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্ট ও আঞ্চলিক অকৃত্রিম সুরে গেয়-সংগীতকেই লোকসংগীত বলে। লোকসংগীতের উদ্ভব ঠিক কবে থেকে তা জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় মানুষ যেদিন থেকে দলবদ্ধভাবে বাস করতে শিখেছে সেদিন থেকেই তার উদগ্র বাসনাকে নৃত্য গীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে শিখেছে। সংগীতের সুর মূর্ছনা খুব সহজেই মানব মনভূমিকে আর্দ্র করে তোলে, যে আর্দ্রভূমিতে আশা আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করে সহজেই অভিনব শিল্পরূপ ফসল ফলাতে পারে। এই লোকসংগীত বা লোকায়ত সংগীত সাধারণত লোকভাষায় রচিত। লোকসংগীতকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। একটি তার বিষয়গত দিক অপরটি তার ব্যবহারিক দিক। বিষয়ের দিক দিয়ে লোকসংগীত নানাধরনের হয়ে থাকে - যথা - প্রেমমূলক, পূজা মূলক, রাজনৈতিক বিষয়ক, দেশপ্রেমমূলক ইত্যদি। ব্যবহারিকের দুটি দিক রয়েছে, একটি - ধর্মানুষ্ঠানে গেয়, অপরটি - ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতিতে গেয় লোকগান। এই লোকসংগীত এককভাবে ও সমবেতভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। সমবেতগনের মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীচেতনার প্রকাশ পায়। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, যে গানগুলিকে আমরা লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এই সমস্ত গানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারি।

মূলত বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত এদেশে বসবাসকারী নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী এক বিশেষ জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র নামে পরিচিত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায় অসহায় মানুষের ভয় ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, তারা আবিষ্কার করেছে নানা লৌকিক দেব-দেবীর, নানান পূজা-পার্বণ,

আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত, রীতি-নীতির মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এই সকল পূজা-পার্বণ-ব্রত অনুষ্ঠানে নানান সংগীতের মাধ্যমে তাদের প্রার্থনা জানিয়েছে। আর এই লোকসংগীতের ধারা বংশপরম্পরায় মুখে মুখে বয়ে নিয়ে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষেরা যখন বাইরের কাজে ব্যস্ত থেকেছে তখন মহিলারা ঘরে বসে থাকেনি। তারা ও তাদের মতো করে সংগীতের সাহায্যে নিজেদের মনস্কামনা তুলে ধরেছেন। নমশূদ্রসমাজের নারীদের দ্বারা পালনীয় একটি বহুল প্রচলিত পুজো বা ব্রত হল ‘হ্যাচরা’ বা ‘হ্যঁাচড়া’। সঙ্গীতই এই পুজোর মূল উপাচার। উত্তর ফরিদপুর জেলায় পৌষ মাসে ও দক্ষিণ ফরিদপু র, বরিশাল, যশোর, খুলনা জেলায় মাঘ মাসে এই পুজো হয়ে থাকে। মূলত ঘা প্যাচরা থেকে মুক্তি পেতে এই পুজো শুরু হলেও পরবর্তীতে নারীরা তাদের মনের মতো পতিলাভের আকাঙ্ক্ষাকেও এর সাথে যুক্ত করেছে। এই গানের বিষয়ের বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, কখনো এই গানে উঠে এসেছে রাধা কৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, কখনো হ্যাচড়া দেবী, আবার কখনো পারিবারিক, সামাজিক, পরিস্থিতি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের গান একটি -

‘কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করি আমরা
কুন না কুঞ্জে যাই, যাই হায়রে -
কালো জলে যদিরে কৃষ্ণ পাই।
কৃষ্ণের লইগ্যা রাখছি মালা রাখছি যতনে,
কৃষ্ণ যদি হইত আপন,
ও আমার সাধের মালা পইর্যা যাইত।
সাধের মালা হইল বাসি,
ও আমরা যমুনাতে ভাসায় আসি।

কৃষ্ণের লইগ্যা রাখছি চন্দন, রাখছি গোপনে
কৃষ্ণ যদি হইত আপন,
ও আমার সাধের চন্দন পইর্যা যাইত।
সাধের চন্দন হইল বাসি,
ও আমরা যমুনাতে ভাসায় আসি।

কৃষ্ণের লাইগ্যা রাখছি চূড়া, রাখছি যতনে
কৃষ্ণ যদি হইত আপন,
ও আমার সাধের চূড়া পইর্যা যাইত।
সাধের চূড়া হইল বাসি,
ও আমরা যমুনাতে ভাসায় আসি।

গানটিতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার তীব্র অভিমান প্রকাশ পেয়েছে।

এমনই আর একটি গান –

ও কালো ভ্রমর রে
তুমি আর আইস না বাসি ফুলেতে।
নিশির শেষে আইছ বন্ধু তুমি
শ্রীরাধিকারে কান্দাইতে
তুমি আর আইস না বাসি ফুলেতে।...

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই গানগুলিকে আমরা মুর্শিদাবাদের লোকায়ত গীত 'ছেঁচর গানে'র সাথে তুলনা করতে পারি। ছেঁচর গানের বিচ্ছেদ বিরহের সুরই মুখ্য এবং গানের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য কম। যেমন একটি ছেঁচর গান -

আমি কেন বা পিরিতি করিলাম,
আগে যদি জানাতাম, বধূ প্রেমের এত জ্বালা,
কদমতলায় ঘর করিতাম, থাকিতাম একলারে।

হ্যাচরা গানে রাধাকৃষ্ণের বিষয় ছাড়া পারিবারিক বিষয় নিয়ে এ গান গাওয়া হয়। এমন একটি গান -

বাড়ি ছিল দালান কুঠা,
ও আমার কর্মে ছিল মাটিকাটা।
মাটি কেটে বানলাম বাড়ি,
ও আমার পুষ্প লাগাই সারি সারি।
গাছের পুষ্প গাছে রইল
ও আমার ঠাকুর পূজার সময় হইল।
বাড়ি ছিল দালান কুঠা
ও আমার কর্মে ছিল মাটি কাটা
মাটি কেটে বানলাম বাড়ি
ও আমরা কলা লাগাই সারি সারি
গাছের কলা গাছে রইল।
ও আমার ঠাকুর পূজার সময় হইল।...

এইভাবে, কমলা, বেগুন, কুমড়ো, লাউ ইত্যাদি শব্দ পাশেই পাল্টে পাল্টে গাওয়া হয়।

হ্যাচরা দেবীকে উদ্দেশ্য করে একটি গান -

এবার তুমি যাও গো ঠাকুর

হ্যাচর প্যাচর নিয়া
সামনে বছর আইস তুমি শঙ্খ শাড়ি নিয়া।
এবার তুমি যাও গো ঠাকুর -
হ্যাচর প্যাচর নিয়া
সামনে বছর আইস তুমি মালা চন্দন নিয়া
এবার তুমি যাও গো ঠাকুর।
হ্যাচর প্যাচর নিয়া
সামনে বছর আইস তুমি শাঁখা সিদুর নিয়া,
এবার তুমি যাও গো ঠাকুর
হ্যাচর প্যাচর নিয়া
সামনে বছর আইস তুমি আয়না চিরুনী নিয়া।

এই গানটি সাধারণত শেষের দিনে গাওয়া হয়ে থাকে। গানটির মধ্যে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়েছে, তাকে অনুরোধ করা হয়েছে সমস্ত ঘা-প্যাচড়া নিয়ে এবছরের মত বিদায় নিতে এবং সেইসাথে আগামী বছরে তাদের জন্য মঙ্গলজনক নানান সামগ্রী নিয়ে আসার অনুরোধ করা হয়েছে।

গানগুলির আঙ্গিকগত দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় গানের কথার পুনরাবৃত্তি রয়েছে। একই বাক্য বারংবার ব্যবহার হচ্ছে শুধু কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন হচ্ছে। সহজ সরল ভাষায় এই গানগুলির সাথে গীতিকার লক্ষ্মণের সাদৃশ্য রয়েছে। গানগুলির রচয়িতার নাম জানা যায়না। এরকম অসংখ্য গান রয়েছে হ্যাচরা পূজাকে কেন্দ্র করে। আদিম মানুষ অরণ্যচারী জীবনে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে, বনের হিংস্র জীব-জন্তুকে ভয় পেত। অরণ্যচারী মানুষের পেশা পরিবর্তিত হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তারা সচেতন না থাকায় নানারকম ত্বকের অসুখ দেখা দিত। এসব ঘা-প্যাচরা, ত্বকের নানান সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই নারীরা এসব গানকেন্দ্রিক নানা পূজা-পার্বনের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

নমঃশূদ্র সমাজের পুরুষেরাও সারা পৌষ মাস ব্যাপী ‘হরাণগান’ বা ‘হলুই’ বা ‘হালই’ গান করে থাকে। এই গানের মূল উদ্দেশ্যই বাস্তু ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করা। রাত্রিবেলা দলবেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে পাড়ার ছেলেরা এই গান করে। দলপতিকে একজন, তার হাতে ছোট লাঠি থাকে। গানটি প্রথমে শুরু করে মূল গায়কী এক লাইন গায় বাকীরা পরে সেটুকু আবার গায়। এ ভাবে গানটি এগিয়ে চলে। একটি গান -

ওরে নিমাই কোথায় গেলি
কোথায় গেলি বাপরে নিমাই
শেষ রাত্রি উঠিয়া।
তোর বিহনে যাব আমি অকালে মরিয়া।
এই কি ছিল নিমাই চাঁদরে, এই কি ছিল তোর মনে,

মায়েরে বাঁধলি নিমাই - শক্তি সেলের বানে।
এত দুখ লক্ষ্য করে ভাব কে বা রয় বাঁধিয়া -
সন্ন্যাসীতে যাইব নিমাই মনে ছিল হিয়া।।
তবে কেন বিষ্ণুপ্রিয়া করেছিলি বিয়া -
নবানি করলি বলো বোঝাবো কী দিয়া।
পাষাণে কুটেছি মাথা পাগলিনী হইয়া।
ওরে নিমাই কোথায় গেলি।

বাংলাদের জনপ্রিয় মহাপুরুষ বহুচর্চিত নিমাই 'হরাণ' গানের ও অন্যতম বিষয়। নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ায় মায়ের মনের যে আকুল আর্তি তাই-ই এই গানটির মূল উপজীব্য। নিমাই ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়েও এই গান রচিত। রামায়ণের প্রসঙ্গ নিয়ে একটি গান -

ওগো লক্ষ্মণ কেন্দে বলে -
অযোধ্যাতে রামের জন্ম-সীতাদেবীর বিয়ে।
লক্ষ্মণ কেন্দে বলে রে।
রাম চলিল বনবাসে মা কৌশুল্যা কান্দেরে।
আগে যায় রে রামচন্দ্র মধ্যে যায় সীতা দেবীরে,
জননী লক্ষ্মণ কেন্দে বলে রে।।
তার পিছনে যায় লক্ষ্মণ সারথী
লক্ষ্মণ কেন্দে বলে।
এইভাবে তিনজন করিল গমন,
লক্ষ্মণ কেদে বলে রে।
রাবণের বোন সুর্পনখা-আসে বলে ফুল তুলিতে
লক্ষ্মণ কেন্দে বলে রে।
তাহার নাক চুল, লক্ষণ কাটিল রে।
সেই কথা সুর্পনখা বলে দাদার কাছে;
লক্ষ্মণ কেন্দে বলে রে।
রাম রাবণের মহাযুদ্ধ হইল রে;
লক্ষ্মণ কেন্দে বলে রে।
হইল সীতাকে উদ্ধার করিল পবনের নন্দন রে'
লক্ষ্মণ কেন্দে বলে রে।।

রাম-সীতা লক্ষ্মণের বনবাসের যাত্রা ও সূর্পনখার আগমন ইত্যাদি রামায়ণের বিষয় নিয়ে গানটি রচিত। হরিনামের প্রসঙ্গ ও কখনো কখনো গানে উঠে আসে - যেমন -

কলির জীবের অন্যগতি নাই,
এই হরিনাম বিনে।।

মায়াজালে এই হরিনাম ভুলে রইলি কেনো,
কি গতি হইবে তোমার, পরাণ নাথ নিদানে।
ভাই বল বন্ধু বল আত্মীয় স্বজন
যার যার সময় হইলে চলে যাবে তখন।
একা একা যেতে হবে, তার করছ কী
নিয়া এসেছো দারুণ কড়াল মনে পড়ে ?
কার্ত্তিক বলে বৃথায় সময় গেল --------------------।
ওরে একবার হরিবল মন।

এধরনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে হরাণ গান বা হলুই গান করা হয়। কেউ কেউ এ গানকে হৈলবৈল গানও বলে থাকে। এসব গানের সাথে সাধারণত কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। কোন কোন দল অবশ্য হারমোনিয়াম ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু রাত্রে বেলা এই গান গাওয়া হয় তাই আগে যখন বিদ্যুৎ ঢোকেনি গ্রামে তখন গানে হ্যাচাক লাইট বা হ্যারিকেন সাথে করে নিয়ে যেতো। গ্রামের নিরক্ষর মানুষেরা তাদের অনভ্যস্থ গলাতেই এই গান করে থাকে, এই গান গাওয়ার জন্য তারা কোন তালিম নেয় না। বাবুরাম মন্ডল, তাঁর 'সাধক গোবিন্দ চাঁদ এবং অজানা দয়াল গান' গ্রন্থে বলেছেন - 'হলুই বলে যে বহুবিধ লোকগীতি গাওয়া হয় ভাটিয়ালিকে তার ভিত্তিস্বরূপ ধরা যায়। বিশুদ্ধ ভাটিয়ালিতে তাল থাকে না। কয়েকটি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করার পর একটা লম্বা একটানা সুরের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু হরাণ গান তা নয়, এর ছন্দ, তাল, লয় সবই আছে। হারমোনিয়াম ঢোল এবং বাঁশের বাদ্যি সহযোগে পরিবেশন করলে শুনতে মন্দ নয়। তবে এ গানের তামিল লাগে না। বাদ্যযন্ত্রহীন অপটু গলায় গাওয়াই রেওয়াজ। (প্রবন্ধ - অবলুপ্তির পথে হরানগান - পৃ৩১)। পৌষমাস ব্যাপী গান গাওয়া হলেও সংক্রান্তির আগের কয়েকটি সন্ধ্যায় বেশি গাওয়া হয়। অনেক সময় একাধিক দল ও বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তখন গৃহকর্তা অনুমতি দিলেই গান গাইতে পারে। কোথাও ছোট ছোট শিশুদের রাধা কৃষ্ণ সাজিয়ে নাচ দেখিয়ে গান করা হয়। যদিও এসব এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। হরাণ গানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা দুরকমের রীতি দেখতে পাই। গোপালগঞ্জের নমঃশূদ্ররা সংক্রান্তির দিন কুমীর বানিয়ে বাস্তুপুজো করে আর উত্তর ফরিদপুরের নমঃশূদ্ররা কলাগাছ পুতে সোনারায়ের বিয়ে দেয়। পৌষসংক্রান্তির দিন সকলে মিলে মহোৎসব বা 'মহাচ্ছোপে' মেতে ওঠে। অরণ্যচারী মানুষ যখন তাদের সন্তান প্রতিপালন, ঝড়ে জলের হাত থেকে রক্ষা পেতে একসময় বাসস্থান নির্মাণের তাগিদ অনুভব করল তারা তখন গৃহনির্মাণ করলো। অসহায় মানুষের কাছে বাসস্থান গৃহই মন্দির হয়ে উঠল। তারা মনে করলো এই বাসস্থানের

দেবতা বাস্তুদেব বা বাস্তুঠাকুরকে সন্তুষ্ট করলেই তারা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। তাই তারা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তুঠাকুরকে ঠান্ডা করে। বাঘ, কুমীর, নানা শ্বাপদসঙ্কুল জল জঙ্গলে ভরা বাংলাদেশে নির্ভয়ে বসবাস শুরু করে। 'বাংলা লোক সংগীত কোষ' গ্রন্থে হীরামন পোদ্দার 'হালই-গীত বা হালুই গান' প্রবন্ধে এ গানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'হালই গীতের জন্ম যে দেশে সে দেশ নদী-নালায়, খাল-বিলের দেশ কুমীর-হাওয়ের দেশ, তাই বাস্তু পুজোর উঠে এসেছে কুমীর। মাটি দিয়ে কুমীর তৈরী করে তাকে পুজো করার প্রচলন আছে। খাল-বিল পাড়ি দিয়ে জমি চাষ করে ফসল ফলাতে যাতে কোনও বিপত্তি না ঘটে তাই কুমীরকে পুজো করা হয়। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। বাংলার পুজো-পদ্ধতিতে তার পরিচয় মেলে, সেকথা আমাদের সকলেরই জানা। হালই গীত বা হালের গীত তেমনি বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত একপ্রকার লোকগীত।' (পৃ ৬৯৪) এই উক্তির প্রেক্ষিতে একটা বিষয় আমরা অনুমান করতে পারি নিরাপদ বাসস্থানের সাথে সাথে কৃষিজীবী এই জনগোষ্ঠীর সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি ও কাম্য ছিল। হয়তো কৃষিকাজ করতে করতে তারা 'হরাণ' বা হয়রাণ হয়ে যেতেন, ফলে এর থেকে মুক্তি পেতে এই গান, কিম্বা হালচাষের উদ্দেশ্যে এই গান করা হয় বলে এই গানকে হরাণ গান বা হালের গান বলা হয়। এই গানের কাব্যগুণ তেমন না থাকলেও এসব গানের মধ্যে দিয়ে আমরা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

এরকম অফুরন্ত গানের ভান্ডার এই সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যা মূলত মুখে মুখে চলে আসছে বংশ পরম্পরায়। গানের বিষয় বৈচিত্র ও কম। এই গানগুলি ঐ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতির প্রামাণ্য দলিল। যন্ত্রসভ্যতা ও একমুখী নগরসভ্যতার ফলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এসকল গীতের ধারা আজ কর্কটরোগের আক্রান্তের ন্যায় অসহায়ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। গানগুলি নমঃশূদ্র সমাজের নিজস্ব সম্পদ। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে গানগুলি শুধু এই সমাজেই প্রচলিত। অন্যকোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে এসব গানের প্রচলন আগেও ছিল না, এখনো নেই। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে গেলে গানগুলি সংগ্রহও সংরক্ষণের পাশাপাশি সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজন, ঐতিহ্যবাহী এ সকল গান নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ। এর মধ্যে এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় নিহিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১।বাবুরাম মন্ডল - 'সাধক গোবিন্দ চাঁদ এবং অজানা দয়ালগান'। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০২০

২।সম্পাদনা - কাকলী ধারা মন্ডল, - 'বাংলা লোকসংগীত কোষ।' অমরভারতী, কলকাতা-৯, ২০১৩।

Ode to the Angel of Correction

Debojyoti Dan
SACT (Department of English)

Come and uneducate me O my Angel!
It is the May of the Year Two Thousand and Twenty-one.
The year of Corona Virus and Thunderstrom.
The post Anthropocene age of post humanism;
The year of pandemic pandemonium,
Death by burning,
Death by thunder,
Death by virus
Death here, death there, death everywhere.
Narration- political, theological and ecological
Stitched characters, mended sentences, and blotted names.
The blue syringe injecting rhetorical thoughts
In the paled veins of silent pages.

The Angel sits on the terrible pile
Of bleeding books and human skulls
Of animal skins and barren fields,
Tainted by political necessity,
Tained by policies,
This is the exodus to the land of Death.

Hail Eliot for thy masterpiece ‘The Waste Land!
Hail Camus for thy ingenious ‘La Peste’!
Hail Marquez for thy moving ‘El amor en los tiempos del colera’!
No love here ....
Only masks and gloves ..

And digits of webinars ...
Education is sold to the prostitute of souls
Sanitizers smelling even in the corpses
Dettols and Savlons! Sanitized dead bodies ...
Thy spell oh hygienic Angel! Come and take us all!
No?

The terrible pity of the dear Angel,
Complete the earth with a written word!
Seal us and bill us and de-purify us.

Rainbow miracle at thy will,
Thou art my Angel and my obsession,
Thou art my Nothing and my perfection,
Thou art the sense of absence in presence,
And yet not absent in my present ...
Tenses - past, present and Future,
In the placenta of my thought.
Thou art the sunset opened in emptiness,
Thou hast the power over the syntax
To correct my grammar of life and death.

Understanding Sustainable Development, Economical growth and India then & now

Dr. Sumit Kumar Debnath
Asst. Prof.
Naba Ballygunge Mahavidyalaya

Economical development, generally, is the sole criterion for measuring development of any country; better to say that it has normally been accepted as the approach to development. Among the countries in the world the richer are often called the 'developed' countries where as the poorer ones are marked as the 'developing' economic. In this context, we can say that economic development may control and lead to prosperity and progress. Now, one can raise the question -- Is economic development really the only bench-mark for measuring development and playing a key-role in sustainable development?

'Standard of living, is the subject which is related to economic development. Standard of living is inter-related with the consumption of goods and services by anybody. This individual person spending more on him/her will be said to have higher standard of living. Then this individual person belongs to above the average of living. In this scenario, the term, 'Quality of life' is more holistic. 'Higher standard of living' is not the measure-scale of better 'Quality of life'. Quality of life depends on social and mental security, equality, healthy social-relation, sense of equality and justice, freedom of expression, basic needs and services, etc. Quality of life relates to physical, mental, spiritual and social condition of human. This quality of life, now, is the essential ingredient of development, though it may not be possible to measure in economic context or put economic value to the quality of life.

Karl Marx evoluted sustainable development in this way – "The development of civilization and industry in general has always shown itself so active in the destruction of forests that everything that has been done for their conservation and production is completely insignificant in comparison."

The Models of Sustainable Development:

The Egg Moddel : _Two parts of an Egg, the white part and the yellow part, represents the ecosystem and the human receptively. The model which is called the 'egg of sustainability'.

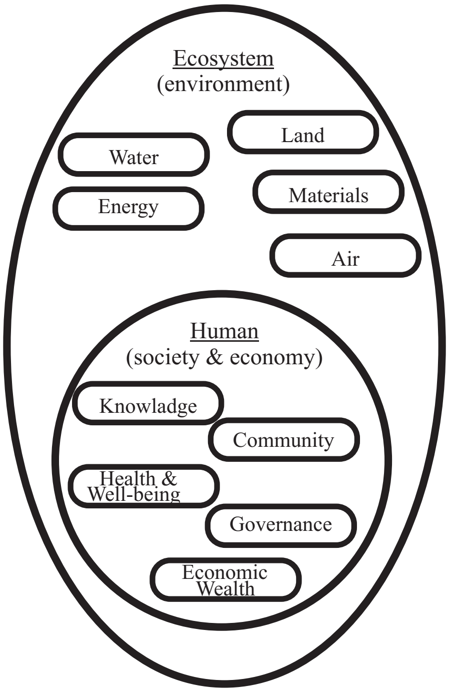

This structure shows that when the condition of human and the condition of ecosystem are secure and in satisfactory state, then the society is to be said sustainable.

The other two models of sustainable development are most well-known and popular also. These models have three interconnected circles of Environment, society and Economy. These models are based on considering society, but not cleanly taken into account of 'quality of life' of human.

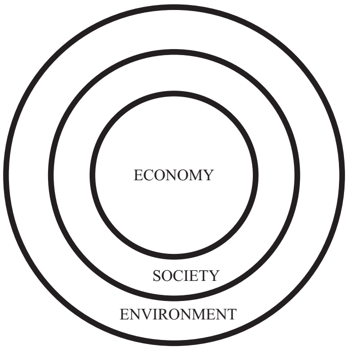

Pic.1

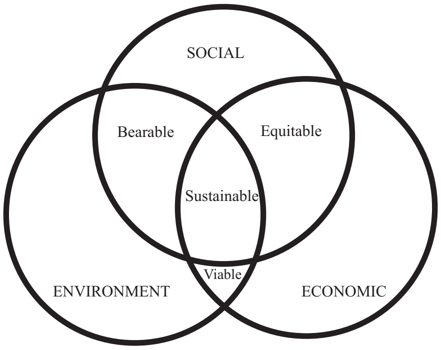

Pic.2

The second one (pic.2) is called 'three pillars model'.

Economic growth and equity, conserving natural resources, the environment and social development are the main areas where the development truly exists.

In our views, the world stands on a system, that connects space and time. When we think of the world in the contest of space, we realise that presticides sprayed to land-convered region could harm water-base, the fish stocks of the coast of a nearby river and ocean. When we think of the world as a system of time, we may consider that the decisions taken by our forefathers in time immemorial continue to affect agricultural practice till date, So, the economic policies, which we wish to approve today will have an impact on urban poverty and growing children.

The one of the two main concepts of sustainable development is 'needs' , the compulsory needs of the poor people. Other is 'limitations'. We should prioritize the essential needs of poor people and the limitations of the present state of technology of the social organisation on the ability of environment to join the needs of near future. We have a whole host of definition of sustainable development may refer to one of them: "Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." It is from 'Our Common Future', known as the Brand Hand Report.

Economic viability is an important condition for any type of development. But it is also true that in order to make a development-process a sustainable one, we must ignore the socially-appropriate and environment-friendly policies and practices.

India is the world's second most populous country. With near about 7.96 billion population of the world, our country represent 17.7% of the estimated world population. Due to green revolution, the agricultural productivity massivly increased in India. In the last 60-70 years, due to medical advances, We have seen a rapid increasing line-up in the population chart of our country.

India is constituted of 7.6% of all mammalian, 12.6% of all avian, 6.2% of all reptilian, 4.4% of all amphibian, 11.7% of all fish and 6.0% of all flowering plant species. With an average annual GDP growth-rate 0f 5.8% for the past two-three decades, the economy is among the fastest growing in the world, with 437.2 million people in April 2022. It was477 million in 2021. India has the second largest labour force-power in the world.

Year	Population	Yearly	World Population	India Global Rank
2020	1,380,004,385	1.04%	7,794,798,739	2
2025	1,445.011.620	0.92%	8,184,437,460	2
2030	1,503,642,322	0.80%	8,548,487,400	1
2035	1,553,723,810	0.66%	8,887,524.213	1
2040	1,592,691,513	0.50%	9,198,847.240	1
2045	1,620,619,200	0.35%	9,481,803,274	1
2050	1,639,176,033	0.23%	9,735,033,990	1

(Source: Worldometer / www.worldometer.info)

The current population of India is 1,415,792,480 as of Thursday , February 23,2023 where as China, it claims 1,453,977,516, based on Worldometer elaboration of the latest United Nations data. The world's population growth rate is 0.84% per year from the last year as of 2022. The UN data estimates the July 01 2023 population at 1,428,627,663. Now India's population rate is to with the growth rate of 0.86% (118th). The population density in India is 464 per square km and the total land area is 2,973,190 square km.

With some diversity of plants and animals, India hosts an enormous type of flora and fauna. India has four biodiversity hotspot out of the 36 hotspot in the world. In land surface, India covers only 2.4% of the earth. Inspite of this insignificant coverage, India has healthy percentage of 8.1% of 2 total genetic resources in the world. According to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), India is 'mega-divere country'with 2.4% of world land area, accounts for 7 to 8% of all recorded species including over 45000 species, of plants and 91000 species of animals.

India has wealthy biological richness with these identified species across its biogeographic regions.

According to the source of 'India book', In India, depletion of vegetative cover (means of decadence of vegetation, grass, shrubs, trees or any other form of natural cover considered suitable at time of reclamation) due to natural calamities like epidemics, floods, droughts, cyclones or the habitat destruction, huge population, introduction of toxic imbalance in society or community structure, expansion of agriculture etc. Contribute to the lose of flora and fauna. More than 39 species of mammals, 72 species of birds, 17 species of reptiles, 03 species of amphibians, 02 species of fish and a huge number of butterflies, moth and beetles are considered unsafe and endangered.

(Source: India Book 2020 - A Reference Annual)

India is the 12th mega-diverse nation in the world with a Bio D score of 0.46 on the diversity index. India is one of the biodivers-rich-countries in the world with 23.39% of its geographical area under forest and tree coverage. A survey by the Zoological Survey of India (ZSI), reported a total of 102,718 species of fauna, with 557 new species including 407 newly described species and 150 new country records.

GROUP	**No. of Species in the world (SW)**	**No. of species in India (SI)**	**% (SI/SW)**	**Rank**
Mammals	4,629	410	8.86	8th
Birds	9,746	1228	12.6	8th
Reptiles	6,550	428	6.2	5th
Ainplibians	4,522	197	4.4	15th
Fishes	21,730	2546	11.7	-
Flowering Plants	250,000	15,000	6.0	-
Angiorperms	-	14,500	-	15th-20th

source : en.wikipedia.org/wiki/Fauna_of_India & http:// www.teriin.org/biodiv/status.htm)

India has the greatest number of cat species in the world. The World Conservation Monitoring Centre gives the estimate that in India there is of about 1500species of flowering plants.

Inspite of our country's attractive economic growth over the past decades, it still stands as one of the poorest countries of the world. The percentage of people living here below the international poverty line .

According to a study by the International Food Policy Institute (IFPRI), we can see that despite massive growth of economic status in and from the early 1990's , this has not had a remarkable impact on rural-poverty. Major analysts were of the opinion that the failure to reduce rural poverty is due to the fall in the public investment in agricultural which constitutes the 70% of the livelihood of the Indians. According to 'Statistics & facts – statista, in terms of employment, the agriculture sector provides lovelihood to over 151 million prople. The people of this industry, contributing about 18% to India's GDP. The price fluctuation in recent years in various agricultural products due to trade libaration afflicted the farmers. Now, we should try to investigate the relations between poverty, aceer to basic amenties, life resources, environmental degradation and resource usage.

Some of the Sustainable Development Concerns that India faces presently -

A. BIODIVERSITY :

Apart from human life with its various habits, the earth has wide range of plants and animals and ecosystem. The diversity in food, medicine, clothing, shelter as well as the spiritual and recreational needs of people round the world go to constitute the Bio-diversity. It also regulates other things such as supply of clean water, nutrient cycling and soil protection. India is trying to reduce green house gases (GHG) and make sure that her per capita emission will be less continuiously untill 2030-31. The ensurance is that the range of emission (per capita) in 2031 will be lower. The estimate is that it will be less than world emission (per capita).

The latest data is that CO_2 level in atmosphere has escalated compared to what it was three to five million years ago. It is very significant that the levels of CO_2 in atmosphere reached 403.3 parts per million (ppm) in 2016 from 400 ppm in 2015. We should be worried about this fact that the rate of emission her increased 50% higher than the average for the past 10 years. World Meteorological Organisation (WMO) chief Petteri Taalas said that 'there is hope' to reverse the

worrying concentration rates but underscored that the time is to act now. Taalas said, “Without frequent cuts in CO_2 and other greenhouse gas emissions, we will be heading for dangerous temerature increases by the end of this century.”

(Source : The Times of India, Kolkata, October 31, 2017; page -13)

Our modern civilization often makes negative impact CO_2 in atmosphere rises 145% over per-industrial (before 1750) measure-line. Methane (CH_4) rises by 257% and Nitrous Oxide (N_2O) up by 122% since 1750. It’s a worrying rise. India’s share of global CO_2 emission is 7.3% Co_2 emission in India to increase by 6% in November, 2022.

In India, since 1990, CO_2 emissions have increased by more than 300% to reach 2.56 billion metric tons (Gt CO_2) in 2019. It is recorded as a high level emissions. CO_2 emissions drops in 2020, due to the outbreak of Covid-19, but it is expected to rebound substantially in 2021. India is now the third-biggest carbon emitter in the world, accounting for 7% of global emissions in 2020. Although India produces considerably power per capita emission, lower than many other countries. At just 1.77 metric tons per person, it maintains the lower level of the global average.

Over a 100 years period, with the impact of 28 times bigger than carbon dioxide, India sets herself as the fourth largest emitter of greenhouse gas methane.

Nitrous oxides (N_2O) emissions in India have increased by more than 40% since 2000, the one of the main causes of N_2O emissions in India is the agriculture sector. Emissions of N_2O in India reached 256.88 million metric tons of CO_2 equivalent in 2018.

B. SUSTAINABLE AGRICULTURE:

From the ancient age to the present time, agriculture remains the main root of Indian economy. There was surplus food production by the traditional ways of farming at that time. Now, modern agriculture with technological advancement has taken place. Modern agriculture means machines and technology-biotechnology. However, rapid population growth and shrinking agricultural land is a serious concern today. The situation becomes grave as the demand for agricultural production is mounting up.

Agriculture has three basic components like the regular processes of most industries: inputs, process and outputs. The outputs, in this case include a number of by-products or waste-materials. There are even unforeseen impacts in this field. Regulating these three basic steps of agricultural functions lead to the better-functioning of economic and social efficiency.

Sustainable agriculture means the utilisation of farming techniques that protect

the environment, public health, communities and animal welfare -- the production of plant and animal products including food, in a way that utilises. With long term effects including degrading topsoil, depletion of groundwater levels and reduce biodiversity, sustainable agriculture offers much needed alternative to traditional input intensive agriculture.

"Sustainable agriculture is far from mainstream in India, with only 5 (corporation, agroforestry, rainwater harvesting, mulching and precision). SAPSs (SAPS -- Sustainable Agriculture Practices and Systems.) scaling beyond 5% of the sown area." (Gupta, Niti, shanal Pradhan, Abhishek Jain and Nayha Patel 2021. Sustainable agriculture in India 2021 -- what will know and how to scale up. New Delhi.)
Agriculture is a part of the primary sector of the economy. In India, agriculture contributes nearly 14% of the country's GDP.

C. ENERGY : (use and associated concerns.)

In the present time, the 'development level' of a human society is defined based on the 'level of energy consumption' by the society . High-limit and inefficient energy usage and misuse of energy has created various problems - locally, globally, environmentally, socially. There is a big space between the energy-demand and its supply. How long the usage of energy can be sustained?

INDIA'S ENERGY DEMAND IN THE GROWTH SCENARIO

Difference from the Reference Scenario in 2030

	2005	2015	2030	2005-2030	Mtoe	%
Coal	208	337	700	5.0%	79.9	12.9
Oil	129	204	416	4.8%	88.3	26.9
Gas	29	61	136	6.4%	43.2	46.7
Nuclear	5	17	40	9.2%	6.9	20.7
Hydro	9	14	24	4.1%	1.4	6.3
Biomass & waste	158	167	183	0.6%	-11.6	-6.0
Other renewable	1	5	10	12.3%	1.1	13.2
Total	537	804	1508	4.2%	209.2	16.1

* Average annual rate growth. Source: world Energy Outlook, 2007.

Because of huge and rapid use of green technology, India now stands on green-building platform/board with leading countries like United States. According to the Indian Green Building Council (IGBC), India will take the top place. Now, the vision is to enable a sustainable built environment for all and facilitate India to abe one of the global leaders in sustainable - built - environment by 2025.

With a good practice to energy-efficient system, Indian energy market has been

changed and changing rapidly. India energy market report offers a positive overview to the energy sector in India. With 2016 market data (on oil, gas, coal and electricity), the report express views to tackle national energy challenges and capture opportunities.

Natural gas production climbed up in 2009 and 2010 following the start-up of production (at the Krishna Godarai Feild by Reliance Industries). Reaching 51 bcm, production dropped back to 31 bcm in 2016 because of technical problems. This production is 6% lower than 2014 and 34% lower than in 2011. This data shows the obvious future-impact on Indian energy market.

In India, "Total energy consumption per capita remains very low: 0.67 toe in 2016, compared to 1.9 toe per capita at the global level, 1.4 toe per capita in the Asian region. Electicity consumption per capita was 814 KWh in 2015, vs a global avedrage of 2870 KWh capita and 2260 Kwh in Asia ."

(Energy Market Report, Indian Energy Report, update, June, 2017)

India has 18,655 MW of installed renewable energy, accounting for a total of 11 percent of the total capacity of 168,954 MW. This is the estimate of the year 2011. But it was delightful announcement by Dr. Arun Tripathi, the ministry Government of India that "the target includes adding 20,000MW of solar energy by 2022, which would take the share of renewable energy in the total electricity of the country to 15 percent".

(source : Sustainable Development in India, Indian Economy, March 22, 2011. from www.ibef.org/india/sustainabledevelopment.aspx.)

India has an target of 500 GW of non fossil fuel capacity in 2030 and by 2070. She dreams to reach Carbon-nutrality. There is power generation which shared between National public utilities and state utilities with private companies the first part is around 40% and the second part is around 30% power sharing Energy consumption rebounded by 9% in 2021. Three-fourths of the consumption comes from fossil fuels, 40% of which is coal. It is expected that, with contributing to 23% of total power generation, the solar capacity will reach 333GW by 2031.

India also had a target of producing a large number of quantities of natural gas. It was over 22 billion cubic metres by the end of November of the fiscal year 2022. Natural gas production in 2018-19 (P) is about 90.1 million Matrix Standard Cubic Metre per day.

With a rapid economic growth, India is facing a growing population. So it's energy consumption has more than double since 2000. Over 900 million citizens have been connected with electrical facility in less than two decades.

An estimated fall of about 5% in India's energy demand in 2020 due to the Covid 19 Pandemic. There was coal and oil use suffering the biggest the biggest falls.

D. WASTE:

Generally, useless or no longer useful means ‘waste’ to us. Waste has relative meaning; waste for some one, could be a resources for other. With the prograss of civilization, increase of population, mankind has been generating waste and nature became more complex. Industrial revolution creates more consumers. Generated biodegradable and non-biodegradable solid waste polluted the earth and the air.`

E. WATER :

Water means life and water-body is one of the important part of ecosystem. The lack of knowledge of how to use the water resources and the ill-usage of it has created many problems. For the sake of development and for the necessity of increasing population, the water-storage level has got down. The balance of ecosystem now is in danger. So we should do our level best to attain the right balance of our ecosystem.

“By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and Island water, and 10 percent of coastal and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well connected system of protected areas and other effective area based conservation measures , and integrated into the wider landscapes and seascapes.”

(India’s Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity 2014, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, Page-71)

GREEN MARKETING means marketing of products and public demand and fulfilment services through a healthy technology which does not disturb the ecosystem of nature. These marketing services always stand for good to mankind and are environment friendly. Many countries and their industries are getting involved to catch the needs of Green market and trying to build it up. But there is a big gap between ‘understanding and implimentation.

Sustainable use of biological diversity is emphasized through various

Sl.No.	Policy	Relevant Features on Sustainable Use
01.	National Forest Policy, 1998	Aims at maintaining environmental and ecological balance, calls upon the forest based industries to raise their own raw materials, lays stress on meting the fuel, fodder, NTFPs and other requirements of rural and tribal people, and increasing forest productivity at the national level through community involvement.
02.	National Conservation Strategy and Policy Statement for Environment and Sustainable Development, 1992	Provides the basis for integration and internalization of environmental consideration in the policies and programmes of different sectors. It also emphasizes sustainable life style and propermanagement and conservation of resources.
03.	National Policy and Macrolevel Action Strategy on Biodiversity, 1999	Outlines a series of macro-level statements of policies, gaps and strategies needed for conservation and sustainable use of biopdiversity.
04.	National Agriculture Policy, 2000	Seeks to actualize the vast untapped growth potential on Indian agriculture, rural infrastructure and value adition; secures a fair standard of living for the farmers and agricultural workers; discourage migration to urban areas; faces the challenges arising out of economic liberalization and globalization.
05.	National Seeds Policy, 2002	Includes thrust areas such as seed varietal development production, quality assurance, seed distribution and marketing, infrastructure facilities, etc.
06.	National Tourism Policy, 2002	Lays emphasis on ecotourism for helping in eliminating poverty ensuring employment, creating, the status of women, preserving cultural heritage and improving overall environment.
07.	Comprehensive Marine Fishing Policy, 2004	Aims to maximize yield from marine fishery resources while balancing the development needs of the various catagories of fishing communities.
08.	National Environment Policy, 2006	Includes the conservation of critical environmental resources; intra-generational and inter-generational quality; livlihood security for poor, integration of environmental resource use; and improve environmental governance.
09.	National Biotechnology Development Strategy, 2007	Calls for promotion of mass use technologies for sustainable utilization of bioresources.

(source : Convention on Biological Diversity, India's Fifth National Report, 2014, Ministry of Environment and Forests, Government of India, Page, 60-61.)

India is among the first five countries in the world, the first is Asia and the first among the biodiversity-rich mega diverse nations, to have submitted Sixth National Report (NR6) to the Convention report:

* Over 0.3% of total recorded species are critically endangered globally, where as in India, in this category, only 0.08% of the species are recorded.

* With a view to provide food and nutritional security to all without destroying the national resource base while ensuing intergenerational environmental equity, measures have been adopted for sustainable management of agriculture fisheries and forests.

*Steps are in progress to maintain genetic divercity of cultivated plants, farms, livestock and their wild relatives towards minimising genetic erosion and safeguarding their genetic diversity.

There are many problems like high technology adaptation cost, most of the people are unwilling to pay the right price for green and eco-friendly products. The globalization and open market policy are the main reasons against the green marketing.

The so-called well maintained environment makes lives more complicated. Now India is a economically developing country but the said problems still exist. The solution is people's awarness, well and positive thinking and healthy practices.

If this economical development is a revolution, then how green it is?

Naba Ballygunge Mahavidyalaya extends warmest congratulations to the winners for their outstanding achievement in the Inter-college Essay Writing Competition – 'Murcchana 2022'. To honour the winners and acknowledge their accomplishment we proudly publish their winning article in our college magazine.

Social Isolation : Mental and Physical well-being

Sakura Koner (1st)
M.Sc. Zoology, 3rd semester
Lady Brabourne college, Kolkata

Humans are social animals; we thrive on our connections and meetings with fellow humans. We adore out excursions, the glittery photos on social media, we survive because of these interactions. The pandemic ushered in a wave of tough circumstances, the most difficult being social isolation. Maintaining our sanity and mental peace along with our physical well-being has been difficult but I believe our outlook governs our condition.

We must engage in activities that satisfy us when socially isolating. If we are with family, it might be time we renew the lost bonds. For most people I know, we have distanced ourselves from our families, with work pressure, studies, this is the golden opportunity to reacquaint ourselves with them. Pleasure and stability can be derived from the recreations we have postponed all these years. Bring out the paint boxes and diaries to scribble on, romanticise the rains, maybe sing a song, read a book! as for physical well-being, with online classes and work from home, prolonged exposure to laptop acreens has ruined our posture and sleep patterns. However we can exercise regularly, eat well and start that regime now before we succumb to work pressure again.

We are fortunate to be isolating during a time when we can enjoy video calls and chats, let us be greateful that our friends are just a click away. Hardships are a constant part of life, obviously, the pandemic posed a tougher situation but this too can be overcome. We have to believe!

Social Isolation : Mental and Physical well-being

Papui Das (2nd)

Social isolations can be defined structurally as the absence of social interaction, contacts and relationships with family and friends, with neighbors on an individual level, and with 'Sociaty at large' on a broader level.

Social isolation can negatively affect mental health as well as physical health. Research has found that perceived social isolation and loneliness are associated with depression, cohnitive decline, poor sleep quality, a weaker immune system and potential heart problems. Socially isolated people are less able to deal with stressful situations.

During this difficult time of COVID 19 pandemic, it is important to continue looking after the physical and mental health. The Pandemic is quite stressful for every individual and the significant stress can percipitate the occurance, or recurrence of mental disorders in some people especially vulnerable older people. Depression, anxiety and sleep disturbance are common, especially when one is under quarantine or self-isolation.

There's no one size that fits all approach to reduce feelings of illness. Everyone's situation various and therefore it's important to adopt a person-centered care approach. Evidence does suggest that participation in froup activities helps Socialising with people in similar life situations can provide important emotional support during this challenging times. Research also indicates it's best to spend time with others who share a similar purpose, goal or challenge together. This could be a group with similar interest or hobby.

As this research mentioned earlier depression, suicide, dementia, health problems, crime and digression of the elderly considered as a serious social trouble can be said to be the direct result of their social isolation in the end. Moreover, we know that Solitude, isolation are painful things and beyond human endurance.

Social Isolation : Mental and Physical well-being

Madhurya Dey (3rd)
3rd year, (5th Semester)
Vidyasagar College for Women

The word isolation brings back those old times when inmates of wars were caged away in some uninhabited land. This brings out a fear in our mind.

2020, a year of virus killing people, floods and cyclones, earthquakes, insect infections, astersids hitting earth and basically a wholesome pandemic to put a cherry on it.

Battling with covid -19, alongwith masks, soaps and sanitizers, social isolation is also important.

Social Isolation means avoiding physical interactions so that we can avoid many communicable diseases which may be air or droplet borns. Most essentially in this time. Each and everyone of us by now are asymptomatic carriers. If we don't maintain this, we might get affected or may get others affected.

Social isolations shouldn't be felt as getting outcasted. It means staying at our home and keeping ourselves safe from this menacing virus as we all know that our human body is susceptible to the changing environment.

People living alone or in nuclear families shouldn't feel secluded. The various communications apps developed has enabled us to communicate to our acquintances within seconds. Talk to and see our near and dear ones just through a simple touch on our device. Then why depressed? Its just that instead of physically meeting, we are all globally connected together. Apart from this, exercising or spending time with nature mentally will keep us well.

Hence, this is high time for us to be conscious of our body. Instead cursing upon useless things, we should maintain social isolation to keep both ourselves and others safe. It is for our own physical good. It is thus, a way of fighting together to overcome this tough time.

NATIONAL SERVICE SCHEME
SPECIAL CAMP
NABA BALLYGUNGE MAHAVIDYALAYA
27E, BOSE PUKUR ROAD, KOLKATA - 42

(GRADUATE & POST - GRADUATE COURSES)
27E, BOSE PUKUR ROAD, KOLKATA - 700 042
AFFILIATED TO CALCUTTA UNIVERSITY
NABA BALLYGUNGE MAHAVIDYALAYA
(UG & PG COLLEGE, AFFILIATED TO C.U.)

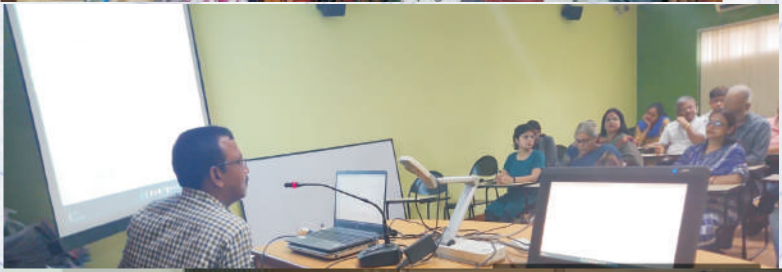

BEYOND LIMITS